মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

ড. মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযকী

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

মূল
ড. মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযকী
অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

(حقوق الانسان والقانون الجنائى)

মূল : ড. মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযকী

অনুবাদ : হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক

বুক সিরিজ : আই এল অ্যর সি-৫

ISBN :

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন ১৪১৪

সফর ১৪২৯

মার্চ ২০০৮

প্রকাশক

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

জোনারেল সেক্রেটারী

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

স্যুট-১৩/বি (লিফ্ট-১২), নোয়াখালী টাওয়ার, ৫৫/বি পুরানা পল্টন

ঢাকা-১০০০ মোবাইল : ০১৭১২-৮২৭২৭৬

Email : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রাপ্তিস্থান

প্রধান কার্যালয় ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার, মগবাজার, কাটাবন

কম্পোজ

র‍্যাক্স কম্পিউটার

ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Manobadhikar o Dandabidhi (Human Rights and Criminal Law), by Dr. Muhammad Al-Tahir Al-Rizki, Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam, General secretary Islamic Law Research Centre & Legal Aid Bangladesh. Suite-13/B (Lift-12), Noakhali Tower, 55/B Purana palton, Dhaka-1000. Mobile : 01712-827276, 01711-345042, **Price Tk :** 120.00, US $ 5

Email : islamiclaw_bd@yahoo.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানবাধিকারের সমস্যাটি অতীতে আর কখনো এত ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি যেমনটি আজকাল হচ্ছে। বিশেষত এ যুগে, যখন মানুষের এ অধিকারগুলো অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক স্থানে লংঘিত হচ্ছে, তখন এটি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়।

মানবাধিকারের বিষয়টি একদিকে যেমন প্রাচীন, অন্যদিকে তেমনি নতুনও। যেদিন থেকে ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির উদ্ভব হয়েছে সেদিন থেকেই বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি বিরাজমান এবং তা আমাদের এ যুগেও যথারীতি একটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রসংগ। মানুষ তার ভাই অপর মানুষটিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য দাবি। পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের এই অনিবার্যতা থেকেই মানবাধিকারের উৎপত্তি। কেননা এই পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদাবোধেই নিহিত রয়েছে মানব সমাজের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, স্থিতি ও অগ্রগতির উপায়।

ইসলাম এ বিষয়টির যথাযথ গুরুত্বই শুধু দেয়নি, বরং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণও করেছে, এর তদারকীতে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনাও নিয়োজিত করেছে এবং একে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িতও করেছে। কেননা তা মুসলিম সমাজকে সকল ধরনের দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিবাজ ও নৈরাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে অত্যধিক আগ্রহী। প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষকেও অন্যায় ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে তা সদা তৎপর ও যত্নবান, যাতে সে সমাজের কল্যাণকর ও উপকারী সদস্যে পরিণত হয়।

মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামের নীতি ও ভূমিকার উদ্ভব হয়েছে ইসলামী আইনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটো উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর বিস্তৃত এবং সকল মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণকারী বাণী হিসাবে আল-কুরআন এই পারস্পরিক সম্পর্কের

www.pathagar.com

কার্যকর ও বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছে, যাতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর এবং এক দল অপর দলের ওপর অত্যাচার, আগ্রাসন ও অনধিকার হস্তক্ষেপ চালাতে না পারে এবং মানব সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করে এই সংগে সমাজ মজবুত ও সুসংগঠিতভাবে স্থিতিশীল থাকে। এ উদ্দেশ্যেই কুরআন থেকে গৃহীত দণ্ডবিধি (হুদূদ আইন) প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়েছে। এ দণ্ডবিধির উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রত্যেক সদস্যের আচরণের সীমা ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়া, যাতে কেউ সে সীমা লংঘন না করে, অন্যের সাথে খারাপ আচরণ না করে, 'কারো ক্ষতি না করে এবং কারো ক্ষতির শিকার না হয়।' অন্যদিকে সুন্নাত শরীয়তের পরিপূরকের ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শরীয়ত এসেছে মানুষকে হেদায়াত তথা সততা ও ন্যায়নীতির পথে চালিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে, যাতে সে সঠিক ও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। তাই সুন্নাহ তার জন্য এমন সব খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত নীতি ও বিধান রচনা করেছে, যা আল্লাহ তার নবী মুহাম্মদ (স)-এর জবানীতে তাঁর বান্দাদের জন্য নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহই তার বান্দাদের সকল ইচ্ছার নিয়ন্ত্রক।

ড. মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযকী
তিউনিসিয়া

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি ৯

মানবাধিকারের সূচনা ৯

ইসলামী শরীআত-এর অর্থ ১০

আভিধানিক অর্থ ১০

পারিভাষিক অর্থ ১১

ইসলামী শরীআতের নীতিমালা ১৩

প্রথম প্রকার ১৩

দ্বিতীয় প্রকার ১৪

তৃতীয় প্রকার ১৪

অধিকার ও তার উৎস ১৯

প্রথম উপাদান ২০

দ্বিতীয় উপাদান ২১

তৃতীয় উপাদান ২১

চতুর্থ উপাদান ২১

মানবাধিকারের উৎসসমূহ ২২

প্রথম অধ্যায় ২৩

ইসলামী শরীআতে মানবাধিকারের উৎসসমূহ ২৩

আইনগত ঘটনার সংজ্ঞা ২৪

অধিকারের প্রকারভেদ ও শ্রেণীবিন্যাস ২৬

প্রথম প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস ২৬

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস ৩০

নির্ধারিত অধিকার ও অনির্ধারিত অধিকার ৩১

প্রত্যাহারযোগ্য ও অপ্রত্যাহারযোগ্য অধিকার ৩২

তৃতীয় প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস ৩৩

www.pathagar.com

চারটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অধিকার রহিত করা যায় ৩৩
চতুর্থ প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস ৩৫
পঞ্চম প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৩
ইসলামী আইনে মানবাধিকার নিশ্চিত করার সমকালীন তৎপরতা ৪৩
মানবাধিকার অধ্যয়নের গুরুত্ব ৪৩
ইসলামে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা ৪৮
ঘোষণার ভূমিকা ৪৯
ঘোষণার ভাষ্য ৫২
১. জীবনের অধিকার ৫২
২. স্বাধীনতার অধিকার ৫৩
৩. সমতার অধিকার ৫৪
৪. ইসলামী আইনে বিচার লাভের অধিকার ৫৫
৫. ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার লাভের অধিকার ৫৭
৬. শাসকের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার অধিকার ৫৯
৭. দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার ৫৯
৮. সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার ৫৯
৯. নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার ৬০
১০. সংখ্যালঘুর অধিকার ৬১
১১. জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার ৬১
১২. স্বাধীনভাবে চিন্তা, বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকার ৬২
১৩. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ৬৪
১৪. দাওয়াত ও প্রচারের অধিকার ৬৪
১৫. অর্থনৈতিক অধিকার ৬৫
১৬. মালিকানা সংরক্ষণের অধিকার ৬৮
১৭. শ্রমিকের অধিকার ৬৯

www.pathagar.com

১৮. জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অধিকার ৭০
১৯. পরিবার গঠনের অধিকার ৭০
২০. স্ত্রীর অধিকার ৭৩
২১. লালন-পালনের অধিকার ৭৫
২২. নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের অধিকার ৭৬
২৩. আবাসন ও অভিবাসনের অধিকার ৭৭

মানবাধিকারের দ্বিতীয় উৎস ৭৭

জাতীয় উৎস ৭৭
জীবন ধারণের অধিকার ৭৯
ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার ৮০
মানুষের সম্মান ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার ৮০

মানবাধিকারের তৃতীয় উৎস ৮১

আন্তর্জাতিক উৎস ৮১

ভূমিকা ৮১
মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক উৎসসমূহ ৮৩
দু'টি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ৮৫
আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারদ্বয়ের ভিত্তি ৮৬

মানবাধিকারের আঞ্চলিক আইনী উৎস ৯১

১. সাধারণ চুক্তি ৯১
২. বিশেষ চুক্তিসমূহ ৯২
আফ্রিকান মানবাধিকার চুক্তি ৯৫
আরব বিশ্বে মানবাধিকার ৯৭
কিছু বেসরকারী আরব উদ্যোগ ৯৮
বিশেষ কয়েকটি আরব দলীল ৯৮
আন্তর্জাতিক আইনীধারাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০০
ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার ১০০
স্বাধীনতার অধিকার ১০৩

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ১১১

অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অধিকার ১১১
ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য ১১১
ইসলামে শাস্তির ব্যবস্থা ১১৪
ইসলামী শাস্তিব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপাদান ১১৪
ইসলামী আইনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি ১১৫
অভিযোগ দায়েরের ব্যক্তিগত পদ্ধতি ১১৬
অভিযোগ দায়েরের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ১১৬
অভিযোগ দায়েরের মিশ্র পদ্ধতি ১১৭
ইসলামে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি ১১৭
অপরাধ ১১৮
ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার ১১৯
ক্ষতিগ্রস্তের বৈশিষ্ট্য ১২২
অপরাধীর অধিকার ১২৩
প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে অভিযুক্তের অধিকার ১২৭
বিচারের স্তরে অভিযুক্তের অধিকার ১২৮
ফৌজদারী বিচার ও কিশোর-তরুণ ১৩১
নিবর্তনমূলক আটকের উৎস ১৩৫
নিবর্তনমূলক আটকাদেশের অবসান ১৩৬
গ্রন্থপঞ্জী ১৩৮

www.pathagar.com

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

মানবাধিকারের সূচনা

মানবাধিকার সংক্রান্ত আলোচনা যেমন প্রাচীন তেমন আধুনিক। সমস্যাটি প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই উদ্ভূত এবং আমাদের যুগেও অব্যাহত। বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনে। কেননা মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হলো দেশে দেশে উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বাভাবিক সোপান। মানবাধিকারের বিষয়টিতে ইসলামের ভূমিকা ও অবস্থান চৌদ্দ শত বছর ব্যাপী সুপরিচিত। এ ভূমিকা ইসলামী জীবনাদর্শের দুটো মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। প্রথমত এই দুই উৎস থেকে প্রণীত বিভিন্ন আইন ও বিধিমালায় তার এ ভূমিকা ও অবস্থান প্রতিফলিত। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী, তাবিয়ীন ও তাদের পরবর্তী ফকীহদের ইজতিহাদ থেকেও তা প্রতিবিম্বিত। তাদের এ ইজতিহাদ ইজমা' (মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মত ও সিদ্ধান্ত), কিয়াস (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' থেকে যেসব সমস্যার সমাধান ও বিধান সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত একই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে উক্ত সমাধান প্রয়োগের উপায় উদ্ভাবন) এবং কিছু সংখ্যক মূলনীতির ওপর ভিত্তিশীল। এসব মূলনীতি ইজতিহাদ (উদ্ভূত সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে আইন প্রণয়নের চেষ্টা) সাহায্য করে। যেমন **"কেউ ক্ষতিও করবে না, ক্ষতির শিকারও হবে না"**। **"প্রচলিত রীতি-প্রথা মীমাংসিত ও অপরিবর্তনীয় বিষয়"** (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া পর্যন্ত)। **"নিশ্চিত বিষয় কোন সন্দেহ-সংশয় দ্বারা অনিশ্চিত হবে না"** (অর্থাৎ বিনা প্রমাণে নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন পরিবর্তন মেনে নেয়া হবে না)। **"কঠিন পরিশ্রম দ্বারা দুঃসাধ্য কাজকে সহজসাধ্য করা যায়"**। **"যে কোন কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারা তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হবে"**। এসব মূলনীতি থেকে প্রণীত অন্যান্য নীতিমালা।

ইসলামের এই ভূমিকা ও অবস্থানের প্রকৃত স্বরূপ সবিস্তারে জানা যাবে ইসলামী শরীআত ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিভাষার ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীআত-এর অর্থ

আভিধানিক অর্থ

ক্রিয়াপদ شَرَّعَ (শাররাআ)-এর অর্থ : প্রকাশ করলো, স্পষ্ট করলো, পরিষ্কার করলো। اَلشَّرْعُ (আশ-শারউ) শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সুস্পষ্ট পথ ও পন্থা। রাস্তা যেমন পথিকের চলাচলের একটা বস্তুগত মাধ্যম, তেমনি শরয়' (الشرع) হলো নৈতিক চলাচলের মাধ্যম, যাকে একজন বালেগ ও বুদ্ধিমান মানুষ জীবন যাপনের পথ, পন্থা বা প্রণালী হিসাবে অনুসরণ করে।[১]

শরীআত (الشريعة) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, 'মানুষের ও জীবজন্তুর পানি পান করার জলাশয়'। তাই আরবী ভাষায় যখন বলা হয় شَرَعَتِ الابِلُ (শারাআতিল ইবিল) তখন তার অর্থ হয়, উটের পাল পানি পান করার জন্য জলাশয়ের পথে রওয়ানা হয়েছে। এটা কল্যাণের পথও বটে।

আভিধানিক অর্থে যে কোন সোজা ও সঠিক পথকেও 'শরীআত' বলা হয়। এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কুরআনের এ আয়াতে :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا.

"অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ পথের ওপর। কাজেই তুমি সেটি অনুসরণ করো" (সূরা জাসিয়া : ১৮)।

অর্থাৎ দীনের একটা সুস্পষ্ট পদ্ধতির ওপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যা তোমাকে সত্যের দিকে নিয়ে যাবে। শরীআতের এই নামকরণের কারণও এই যে, এটা সোজা ও সুদৃঢ় পথ ও পন্থা। এতে কোন বক্রতা নেই ও অস্থিতি নেই। সোজা ও সঠিক পথ থেকে তা কখনো বিচ্যুত হয় না। জলাশয়ের সাথে এর সাদৃশ্য এই যে, দুটোই জীবন রক্ষার উপায় ও পথ। পানি দেহকে সজীব রাখে, আর শরীআত জীবনীশক্তি যোগায় আত্মা ও বিবেককে। একটি দেহের এবং অপরটি আত্মার জীবন রক্ষাকারী। শরীঅতের আর একটা নাম হচ্ছে شِرْعَةٌ (শিরআহ)। সূরা আল-মাইদার ৪৮নং আয়াতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا.

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা শরীআত ও একটা স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি" (৫ : ৪৮)।

অর্থাৎ এমন একটা বিশুদ্ধ ও সরল পথ দিয়েছি, যাতে কোন বক্রতা নেই। شرعة

www.pathagar.com

الماء। (জলাশয়) শব্দটিও এ শব্দ থেকেই উদ্ভূত। এটাও মানুষের পানি নেয়ার জলাশয়। এই স্পষ্টতার প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত নামকরণ করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষা হিসাবে, শরয় (اَلشَّرْعُ), শরীআত (اَلشَّرِيْعَةُ) ও শিরআহ (اَلشِّرْعَةُ) দ্বারা ইসলামের সেই বিধিবিধান ও নীতিমালাকে বুঝানো হয় যা আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য প্রণয়ন, প্রবর্তন ও বিধিবদ্ধ করেছেন, চাই তা ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত হোক, আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিকতা সংক্রান্ত হোক অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের ইবাদত এবং পারস্পরিক লেনদেন ও আচরণ (মুয়ামালাত) সংক্রান্ত হোক।

সুতরাং শরয়, শরীআত ও শিরআহ তিনটিই সমার্থক শব্দ। প্রতিটি শব্দই আল্লাহ প্রদত্ত সত্য ও সঠিক জীবন বিধানকে বুঝায়, যার সাহায্যে মানুষের পিপাসা মেটে। ফলে তার আত্মা ও মন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয় এবং বিবেক খাদ্য ও পুষ্টি লাভ করে। তাতে সে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে সক্ষম হয় এবং দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের সুখশান্তি লাভ করে ধন্য হয়।

শরয় ও শরীআত শব্দদ্বয় থেকে গঠিত হয়েছে ক্রিয়াপদ شَرَعَ ('শারাআ'), যার অর্থ প্রণয়ন, প্রবর্তন, নির্ধারণ ও প্রচলন। شَرَعَ الدِّيْنَ "দীনকে প্রবর্তন ও প্রচলন করেছে" এ কথাটার অর্থ দাঁড়ায়, দীনের মূলনীতিগুলোর প্রবর্তন ও প্রচলন করেছে, তার বিধিবিধানগুলো ব্যাখ্যা করেছে ও স্পষ্ট করেছে।[২] সূরা আশ-শূরার ১৩ ও ২১ নং আয়াতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا.

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দীনকেই নির্ধারণ করেছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে..." (সূরা শূরা, আয়াত : ১৩)।

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ.

"তাদের কি এমন কিছু শরীক জুটেছে, যারা তাদের জন্য আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন ধর্ম প্রবর্তন করেছে" (সূরা শূরা, আয়াত : ২১)।

আত্-তাশরী' (التشريع) 'শার'উ' (شرع) থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষ্য (مصدر), এর অর্থ শরীআত বা বিধান প্রচলন ও প্রবর্তন করা।

www.pathagar.com

'আশ্-শারীআতুল ইসলামিয়া" (ইসলামী শরীআত) হচ্ছে সেই সকল মূলনীতি, বিধিমালা, নির্দেশাবলী ও পদ্ধতিসমূহ, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিল করেছেন, চাই তা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হোক অথবা সুন্নাহ বা হাদীসের অঙ্গীভূত হোক। এই সুন্নাহ মুহাম্মদ সা.-এর কথা ও কাজ অনুমোদনের সমষ্টি। সুতরাং আল্লাহই হচ্ছেন শারে' অর্থাৎ শরীআত প্রণেতা, তিনি যা প্রণয়ন করেছেন তা হচ্ছে মাশরূ' (مَشْرُوْع), প্রণীত, আর তাঁর প্রণীত মূলনীতিসমূহ, বিধিমালা, নির্দেশাবলী ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতিসমূহকে সামগ্রিকভাবে 'শরীআত' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম শাতিবী ইবরাহীম বিন মূসা বিন মুহাম্মদ আল-লাখমী (মৃ. ৭৯৫ হি.) শরীআতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : "শরীআত হচ্ছে সেই বিধান, যা দায়িত্বশীল মানুষের কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে"।[৩]

শরয়, শরীআত, দীন ও মিল্লাত সমার্থক শব্দ। বস্তুত বিধিমালা ও নীতিমালা শরয় ও শরীআত নামে আখ্যায়িত হয়, এগুলো আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত, সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ, অপরিবর্তনীয় ও অকাট্য হিসাবে দীন নামে আখ্যায়িত হয়। এগুলোর অনুসরণ অপরিহার্য এবং এগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করা যায়। আর মিল্লাত নামে পরিচিত মানুষকে তাদের জীবন সুশৃঙ্খল করা ও সহজতর করার উদ্দেশ্যে এসব বিধি অনুসরণ করতে আদেশ দেয়া হয় এই হিসাবে।

পক্ষান্তরে, "আত-তাশরী" (التشريع) শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে উল্লিখিত শব্দগুলো থেকে ভিন্ন। এর অর্থ শরীআত তথা ইসলামী আইন প্রণয়ন, প্রচলন ও প্রবর্তন, হুকুম বা বিধিগুলো বর্ণনা করা এবং আইন রচনা করা। এটা যখন ইসলামের সাথে বিশেষিত হয়, তখন বলায় হয় : تشريع اسلامى ('তাশরী ইসলামী') বা ইসলামী আইন প্রণয়ন, প্রচলন ও প্রবর্তন। আর ইসলাম (الاسلام) শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, বশ্যতা স্বীকার করা। আর পারিভাষিক অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর হুকুমের অনুগত হওয়া এবং তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়া ও সন্তুষ্ট থাকা। শব্দটির এরূপ ব্যবহার বিশেষভাবে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত দীনের বা ধর্মের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আল-কুরআন এদিকে ইংগিত করেই বলেছে :

www.pathagar.com

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীনরূপে মনোনীত করলাম" (সূরা আল-মাইদা : ৩)।

অনুরূপ আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاخِرَةِ مِنَ الْخسِرِيْنَ.

"কোন ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করলে তা তার থেকে কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[৪] (সূরা আল ইমরান : ৮৫)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তার যাবতীয় বিধিমালা ও নীতিমালার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিকসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে সুশৃংখল ও সুসংহত করে। এটি তার প্রতিপালকের সাথে তার সম্পর্ক সংহত করে, তার আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং অন্যান্য লোক ও সমাজের সাথে তার সম্পর্ক সংহত করে। এসব কিছুর সমন্বিত রূপকেই বলা হয় শরীআতে ইলাহী। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এটা কখনো বিকৃত হয় না। কেননা আল্লাহ তায়ালাই এর রক্ষক। আর আল্লাহর রাজ্য যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি আল্লাহর আইনও চিরস্থায়ী। পক্ষান্তরে প্রচলিত আইন যেহেতু মানব রচিত, তাই তা মানুষের মতই পরিবর্তনশীল, বহু স্তরে বিভক্ত। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে সংবিধান, তারপর আইন ও আইনগত বিধিমালা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআত যে সর্বব্যাপী বিধান এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর পরিব্যাপ্ত, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিম্নরূপ। ইসলামী শরীআত তিন প্রকারের নীতিমালা ও বিধিমালার সমন্বয়ে গঠিত :

ইসলামী শরীআতের নীতিমালা

প্রথম প্রকার

সেই সমস্ত বিধিমালা ও নীতিমালা, যা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও তার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়, যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়, এক, অদ্বিতীয় ও

www.pathagar.com

শরীকবিহীন আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর রসূলগণের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, তৎসহ হিসাব, কর্মফল ও শাস্তি। এগুলো আলোচিত হয় ইলমুল কালাম বা ইলমুত্ তাওহীদ নামক স্বতন্ত্র শাস্ত্রে। শরীআতের এই প্রকারের বিধিমালা ও নীতিমালা মুসলমানদের জীবনকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে শৃংখলাবদ্ধ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

নৈতিক বিধিমালা যা মানুষের চরিত্রকে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করা, প্রত্যেক মুসলমানকে উচ্চতর ও মহত্তর নৈতিক নমুনা অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করা, উৎকৃষ্টতর চারিত্রিক গুণাবলী যথা আমানতদারী, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পালন, মহানুভবতা ও ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাকার গুণাবলী অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত। এ জিনিসগুলো 'ইলমুল আখলাক 'তথা নৈতিক বিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র নামক স্বতন্ত্র শাস্ত্রে শেখানো হয়।

তৃতীয় প্রকার

সেই সব বাস্তব ও কার্যকর নীতি ও বিধান, যা মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক, মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে সমাজের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও তা নিয়ে আলোচনা করে। যে সকল নীতি ও বিধান মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে 'ইবাদত' বলা হয়। এগুলো নিয়াত (অভিপ্রায়) ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না, যেমন নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ। আর যে সকল নীতি ও বিধান মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে, চাই তা ব্যক্তি ও ব্যক্তির মাঝে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে অথবা ব্যক্তি ও দলের মাঝে হোক, তার নাম 'মুয়ামালাত'। অর্থাৎ পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন। ইবাদত ও মুয়ামালাত সংক্রান্ত বিধান ও নির্দেশাবলীকে 'ফিক্হ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর 'আবার দুটো অংশ রয়েছে। এক অংশ জাগতিক বিষয় অর্থাৎ মুয়ামালাত তথা পারস্পরিক লেনদেন সংক্রান্ত। অপর অংশ আত্মার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ইবাদত সংক্রান্ত। ফিক্হ শরীআতের তুলনায় দুর্বলতর। কেননা শরীআত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন, যার বাস্তবায়নের ক্ষমতা রয়েছে। (আর ফিকহ হচ্ছে উক্ত রাষ্ট্রীয় আইনের শাস্ত্রীয় ও বিদ্যাগত বা লিখিত রূপ, যার মধ্যে কোন বাস্তবায়ন ও বাধ্যকরণের ক্ষমতা নেই)।

মুয়ামালাত-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে :

১- ব্যক্তিগত অবস্থা সংক্রান্ত বিধিমালা।

www.pathagar.com

২- আর্থিক লেনদেন, মালিকানা, চুক্তি ও এর আওতাভুক্ত ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও বিনিময় ভিত্তিক কাজ, বন্ধক, অংশীদারিত্ব, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

৩- অপরাধ ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধিমালা। ফিক্‌হ শাস্ত্রে এর নাম "হুদূদ, তাযীরাত ও কিসাস সংক্রান্ত বিধান"। আইনজ্ঞদের পরিভাষায় একে বলা হয় "দণ্ডবিধি"। এ বিধিমালা সমাজের মানুষের সহাবস্থানকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করে এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধান করে।

৪- বিচার ব্যবস্থা, আদালত, প্রশাসন, দাবি উত্থাপন ও তা প্রমাণের পদ্ধতি ইত্যাদি, যা নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে। একে বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রণালীও বলা হয়।

৫- রাষ্ট্র পরিচালনা বিধি বা ইসলামী রাজনৈতিক বিধিমালা : এগুলো হচ্ছে শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয়কারী বিধিমালা। আধুনিক পরিভাষায় এই শ্রেণীর বিধিমালা দুই ভাগে বিভক্ত :

(ক) প্রথম ভাগ : প্রশাসনিক অধিকারসমূহ

যেসব আইন-কানুন নির্বাহী কর্তৃপক্ষের তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো এর আওতাধীন। রাষ্ট্রীয় সম্পদ, তার আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণও এর আওতাভুক্ত। অতীতে ইসলামের প্রশাসনিক আইন বিশেষত আর্থিক বিধিমালা সম্বলিত কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হলো :

১. "কিতাবুল আমওয়াল" (كتاب الاموال) লেখক : আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনে সাল্লাম (হি. ২২৪)।

২. কিতাবুল খারাজ (كتاب الخراج) লেখক : আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আল-আনসারী আল-কূফী আল-বাগদাদী। ইনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্য এবং তাঁর মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী প্রথম মনীষী, বাগদাদের বিচারপতি (হি. ১৮২/খৃ. ৭৯৮)।

৩. কিতাবুল খারাজ, ইয়াহিয়া ইবনে আদাম ইবনে আল-সুলাইমান কুরাশী প্রণীত। ইনি খ্যাতনামা কারী, মুহাদ্দিস, হাফেয ও ফকীহ (হি. ২০৩/খৃ. ৮১৮)।

(খ) দ্বিতীয় ভাগ : সাংবিধানিক অধিকার

এটি রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, তার সকল স্তরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের একাংশের সাথে অপর অংশের সম্পর্ক, ব্যক্তির সাথে কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ ও বিধিবদ্ধ করে।

www.pathagar.com

আর এই উভয় প্রকারের আইন, যা প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, আধুনিক পরিভাষায় একটি একক শিরোনামের অধীনে এ দু'টিকে উল্লেখ করা হয়। তা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সাধারণ আইন।

সাংবিধানিক আইন কয়েকটি গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. "আস-সিয়াসাতুশ্ শারইয়াহ ফী ইসলাহির রায়ী ও ওয়ার্ রায়িয়াহ"

السياعة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية.

"শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সংশোধনে ইসলামের নীতি", লেখক : আহমাদ তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া (হি. ৭২০)

২. আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া ওয়াল ওয়ালায়াতুল মাদানিয়া

الاحكام السلطانية والولايات المدنية.

"কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিধি ও বেসামরিক প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা", লেখক : আবুল হাসান আল-বাসরী আশ-শাফেয়ী আল-মাওয়ারদী (হি. ৪২০)

৩. আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, লেখক : কাযী আবু ই'য়ালা আল-হাম্বালী, (মৃত্যু হি. ৪৫৮)।

৬– আন্তর্জাতিক অধিকার সংক্রান্ত বিধিমালা : এই বিধিগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুসংহত করে। অধুনা এ বিধিমালাকে "সাধারণ বৈদেশিক আইন" নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এ জাতীয় বিধিমালা নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে 'সিয়ার, জিহাদ ও মাগাযী' শীর্ষক গ্রন্থ নামে পরিচিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে :

(১ ও ২) "আস-সিয়ারুস্ সগীর" ও "আস্-সিয়ারুল কবীর" লেখক : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী, ইমাম আবু হানীফার শিষ্য, (হি. ১৮৯)

(৩) কিতাবুস্ সিয়ার, লেখক : ইমাম আব্দুর রহমান বিন আমর আল-আওযায়ী (হি. ১৫৭)

৭– নৈতিক বিধিমালা : এ জাতীয় বিধিমালা সচ্চরিত্র গঠনের সহায়ক এবং এতে মানুষের সদগুণাবলী ও অসৎ গুণাবলীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব রকমারি বিধিমালা পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এ যুগে আমরা যত রকমের আইনের সাথে পরিচিত, তার কোন এক দিকের বা কোন এক রকমের আইনকেও ইসলামী শরীআত তার আওতাভুক্ত না করে ছাড়েনি। ব্যক্তিগত,

www.pathagar.com

সামাজিক ও আন্তর্জাতিকসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই সে নিজের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আর এ থেকে আমরা বুঝি, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সকল স্থান ও সকল যুগের জন্য উপযোগী। এ থেকে আমরা আরো অনুধাবন করি, ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহর এই মহান উত্তরাধিকারে কত কল্যাণ ও উপকার নিহিত রয়েছে, যাতে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিভাত হয় যে, সকল আধুনিক মানব রচিত আইনের চেয়ে ইসলামী আইন অনেক বেশী উদার, ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী এবং ইসলামী শরীআতের প্রতিটি বিধির সাথে কেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে অংগীভূত রয়েছে আধ্যাত্মিক চেতনা ও আল্লাহর আনুগত্যের অনুভূতি। এই চেতনা ও অনুভূতিই মানুষের বিবেককে সর্বক্ষণ লালন করছে।

ইসলামী শরীআতের সকল অংশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর তৃতীয় অংশে রয়েছে ইবাদত ও মুয়ামালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যকর ও বাস্তব বিধিমালা। বিশেষভাবে এই অংশটিই ইসলামী ফিকহ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সুতরাং এই ফিকহ, বিশেষত তার যে অংশটি মুয়ামালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা আইন শাস্ত্রের পাশাপাশি একটি অংশ। কেননা ফিকহের মুয়ামালাত সংক্রান্ত অংশ ও আইন শাস্ত্র মানুষের কর্মকাণ্ডকে এবং অন্য মানুষের সাথে ও সমাজের সাথে তার সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ, শৃংখলাবদ্ধ ও সংহত করে। আর এ কারণেই মুয়ামালাত বিষয়ক ফিকহ্-কে 'ইসলামী আইন' নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর ইসলামী ফিকহের যে অংশ মানবদেহ ও জীবনের উপর হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত বিধি সম্বলিত, তাকে 'ইসলামী ফৌজদারী দণ্ডবিধি' নামকরণ করা যেতে পারে। এই আইন মূলনীতির আকারে এসেছে বলে মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) তা থেকে আল্লাহর বিধান প্রণয়ন করে নিতে এবং প্রত্যেক স্থান ও কালে নিত্য নতুন উদ্ভূত সমস্যাবলীর ইসলামী শরীআত অনুমোদিত সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন। কুরআনে শুধু যে ইবাদত সংক্রান্ত আয়াতই রয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে মুয়ামালাত অর্থাৎ পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত আয়াতও অনেক রয়েছে। এতে যেমন রয়েছে ব্যাপক ভিত্তিক ও নির্দিষ্ট বলয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত আয়াত, যেমন রয়েছে সাংবিধানিক, প্রশাসনিক, আর্থিক ও শাস্তিমূলক আইন সম্বলিত আয়াত, তেমনি রয়েছে পারিবারিক আইন, পৌর আইন, বাণিজ্যিক আইন ও বিচারিক মূলনীতি ভিত্তিক আইন সংক্রান্ত আয়াত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংগনে কুরআন প্রায় পঁচিশটি আয়াতে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায় অমুসলিমদের সাথে আচরণ ও লেনদেন এবং অমুসলিম দেশের সাথে

২—

www.pathagar.com

মুসলিম দেশের সম্পর্ক রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ উপস্থাপন করেছে। এ সকল মূলনীতির অন্যতম হচ্ছে, যুদ্ধরত শত্রুপক্ষের সাথে আচরণে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, লেনদেন ও আচার-ব্যবহারে সমতা বজায় রাখা, বরং অধিকতর অনুগ্রহশীলতার প্রতি মনোযোগ দেয়া। কুরআন সাংবিধানিক আইন এবং শাসন ব্যবস্থা ও তার মৌল আদর্শ সংক্রান্ত বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্যই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে প্রায় দশটি আয়াত জুড়ে সাধারণ বিধিমালা দিয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় দশটি আয়াতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সব আয়াতে ধনিকদের সম্পদ সম্পর্কে, আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতের শৃংখলা বিধান সম্পর্কে, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মাঝে এবং ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে সাধারণভাবে আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের বিষয়ে নীতিমালা বিদ্যমান। আর দণ্ডবিধি সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে প্রায় ত্রিশটি আয়াতে, যা এ আইনের মূলনীতি বর্ণনা করে, যেমন হত্যা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অপরাধে কিসাস (সমান বদলা) বিধিবদ্ধকরণ, অনুরূপ শরীআত নির্ধারিত হুদূদ (নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ) ও তার শাস্তি বিধান।

পারিবারিক আইন, যথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, ওসিয়াত, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত বিধান এসেছে সত্তরটি আয়াতে। ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত চুক্তি ও দায়দায়িত্ব ও তৎসংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ও সামাজিক বিধিমালা প্রায় সত্তরটি আয়াতে পাওয়া যায়। বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মূলনীতি, যা বিচার, সাক্ষ্য, শপথ এবং অন্য যেসব ব্যবস্থা মানুষকে তার শরীআত নির্ধারিত প্রাপ্য আদায়ের ক্ষমতা ও সামর্থ্য এনে দেয়, তার সাথে সম্পৃক্ত। এ সবের প্রতি ইংগিত ও সূক্ষ্ম নির্দেশনা এসেছে প্রায় তেরোটি আয়াতে। সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতটিও এ ধরনেরই একটি আয়াত। লেনদেন সংক্রান্ত এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিবাদ মীমাংসা করতে হবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণ ও বিক্রিত জিনিসের মূল্য লিখিত হতে হবে। তবে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে কুরআনের ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লিখে না রাখলেও চলবে। এ সকল পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস দ্বারা সুসংবদ্ধ করা হয়েছে।

এসব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় যে, ইসলাম মানুষের অধিকার সংরক্ষণে, সমুন্নতকরণে ও তার মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কত উদগ্রীব! তার এই ধরনের আগ্রহ মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদগুলোর প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী

www.pathagar.com

আগে প্রকাশিত হয়েছে। এসব সনদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ থেকে ১৯৪৮ সালে জারীকৃত বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, ১৯৪৯ সালে চারটি জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, ১৯৭৭ সালে ঘোষিত সংযোজিত দুটো প্রটোকল, ১৯৫০ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত ইউরোপীয় মানবাধিকার চুক্তি এবং ১৯৬৬ সালের দু'টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি।

অধিকার ও তার উৎস

হক বা অধিকার কী?

অভিধানে 'হক' এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে :

১– 'হক' আল্লাহর একটি (গুণবাচক) নাম (পরম ও চূড়ান্ত সত্য অর্থে)। সূরা নূরের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ.

"তারা জানে, আল্লাহই সুস্পষ্ট হক।"

সূরা লুকমানের ৩০ নং আয়াতে এসেছে :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ.

"কেননা আল্লাহই হক।"

২– অকাট্য সত্য, যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

৩– প্রমাণিত, অনিবার্য ও অবধারিত। যেমন আল্লাহ সূরা যুমারের ৭১ নং আয়াতে বলেছেন,

وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

"কিন্তু আযাবের বাণী অবধারিত হয়ে দেখা দিয়েছে কাফেরদের ওপর।"

৪– ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও মালিকানা

৫– বিশ্বাস ও সত্য

ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় "হক"

আগেকার যুগের ফকীহগণ এর কোন পূর্ণাংগ সংজ্ঞা দেননি। কেবলমাত্র সাম্প্রতিক কালের ফকীহগণ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন মোস্তফা

www.pathagar.com

আহমদ আয্-যারকা। তাঁর মতে 'হক' হচ্ছে "এমন কোন একক অধিকার যা শরীআত কাউকে ক্ষমতা বা দায়িত্ব হিসাবে প্রদান করে"।[৫]

উসূলুল ফিকহ শাস্ত্রীয় অধ্যাপক মুহাম্মদ ফাত্হী আদ্-দুরাইনী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : "হক হলো এমন একটা নিরংকুশ অধিকার, যা শরীআত প্রণেতা কোন কিছুর ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে আদায়ের উদ্দেশ্যে কারো জন্য নির্ধারণ করে, যাতে কোন নির্দিষ্ট কল্যাণকর লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়"।[৬]

দুরাইনীর সংজ্ঞা যারকার সংজ্ঞার প্রায় কাছাকাছি। কেবল "যাতে কোন নির্দিষ্ট কল্যাণকর লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়" এই কথাটা যোগ করায় দু'টির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্পষ্ট করাই এর অভিপ্রায়। কোন কোন সমকালীন ফকীহ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

"হক হচ্ছে শরীআতে প্রতিষ্ঠিত একটি অধিকার, যা এমন ক্ষমতা বা দায়িত্ব দাবি করে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করবে।" এ সংজ্ঞা পূর্ববর্তী দুটো সংজ্ঞার কাছাকাছি। লক্ষণীয়, পূর্ববর্তী তিনটি সংজ্ঞাই যথার্থ এবং ফিকহী পরিভাষায় হক শব্দ দ্বারা যে অর্থ বুঝানো হয়, সেই অর্থই প্রতিফলিত করে। হকের সংজ্ঞার উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ করলে হকের তাৎপর্য ও তার ব্যাপকতা অনুধাবন করা যায়।

প্রথম উপাদান

এর প্রথম উপাদান হলো এককত্ব, যার অর্থ নিরংকুশভাবে ও এককভাবে কোন জিনিসের মালিক বা স্বত্বাধিকারী হওয়া। এ হচ্ছে এককভাবে অর্জনকারীর ও অর্জিত হকের মধ্যকার সম্পর্ক। হকের একক স্বত্বাধিকারী বা এককভাবে অর্জনকারী আল্লাহ তাআলাও হতে পারেন। এটা আল্লাহর অধিকারসমূহের মধ্যে অন্যতম অধিকার হিসাবে বিদ্যমান। একে সর্বাত্মক বা সর্বব্যাপী অধিকারও বলা যায়, যা আল্লাহ ছাড়া আর কোন সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য নয়। আবার হকের একক অধিকারী কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠীও হতে পারে। যাবতীয় অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট অধিকার একক ও নিরংকুশ অধিকারের আওতাভুক্ত। যেমন কারো দায়ভুক্ত ঋণ। অর্থ-সম্পদ বহির্ভূত একক অধিকারও এর আওতাভুক্ত, যেমন অভিভাবকের একক অধিকার রয়েছে তার অভিভাবকত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ওপর।

নিরংকুশ এককত্বের বিশেষত্ব বা বাধ্যবাধকতা যুক্ত হওয়ায় যে ক্ষেত্রে নিরংকুশ এককত্ব নেই, তা এর আওতা বহির্ভূত হলো। যেমন উন্মুক্ত প্রান্তর বা বনভূমি থেকে জীবজন্তু শিকার করা বা কাঠ সংগ্রহ করা ইত্যাকার সর্বস্বীকৃত ও

www.pathagar.com

আইনানুমোদিত কাজ। উল্লেখ্য, এসব আইনানুমোদিত কাজ যদিও হক বা অধিকারের সংজ্ঞা বহির্ভূত, কেননা তা কারো একক অধিকারভুক্ত নয়, কিন্তু তা রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণের আওতাভুক্ত। ফকীহগণ মনে করেন, এগুলোতে সকল মানুষের অবাধ ভোগাধিকার রয়েছে, যেমন সড়ক ব্যবহার ও উন্মুক্ত বিচরণ ভূমিতে পশু চারণের অধিকার। কাজেই যখন কোন মানুষকে কোন ন্যায়সংগত কারণ ব্যতিরেকে উক্ত ভোগ ও ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, তখন সে তার প্রতি কৃত যুলুমের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে, যাতে তার প্রতি কৃত অবিচার ও বঞ্চনার অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় উপাদান

শরীআতই এই নিরংকুশ এককত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা রাখে, যাতে এই এককত্ব শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত বলে স্বীকৃতি পায়। তাছাড়া শরীআতের দৃষ্টিভংগীই যেহেতু এককত্বের গ্রহণযোগতার ভিত্তি, তাই শরীআতই এখানে প্রধান নিয়ামক উপাদান।

তৃতীয় উপাদান

নিরংকুশ একক অধিকারের প্রাপক কর্তৃক ক্ষমতা ও দায়িত্ব দাবি করা। এই ক্ষমতা দুই ধরনের : (১) কোন ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা, যেমন কারো ওপর অভিভাবকত্বের অধিকার এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের লালন-পালনের অধিকার।

(২) কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব। যেমন মালিকানা স্বত্ব ও জিনিসপত্র ব্যবহারের অধিকার।

আর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের একটা সার্বক্ষণিক পালনীয় কর্তব্য, যাকে 'আদা' (পালন করা) শব্দ দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞায় প্রকাশ করা হয়েছে। আর আদা বা পালন কখনো ইতিবাচক হয়, যেমন কোন কাজ সমাধা করা, আবার নেতিবাচকও হয়, যেমন কোন কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে সকল অধিকারকে বুঝানো হবে। যেমন আল্লাহর অধিকার, যথা ইবাদত ও শরীআত নির্ধারিত শাস্তি (হুদূদ) প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত অধিকার।

চতুর্থ উপাদান

চতুর্থ উপাদান হলো, 'কোন নির্দিষ্ট কল্যাণকর ব্রত বাস্তবায়িত করা।' এটা যদিও শরীআত কর্তৃক একক অধিকার নির্ধারণের আওতাধীন, তথাপি শরীআত যে উদ্দেশ্যে হক বা অধিকারকে বিধিবদ্ধ করেছে, সে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বর্ণনার খাতিরে এটি উল্লেখ করা দূষণীয় নয়। সুতরাং যখন হক বা অধিকার তার উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হবে, যেমন সমাজের ক্ষতিকর কোন কাজে প্রয়োগ করা হলো, তখন সেই এককত্বের প্রতি শরীআতের স্বীকৃতি ও অনুমোদন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মানবাধিকারের উৎসসমূহ

যে মূলনীতি ও আদর্শ মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিবেদিত, তা আমরা তিনটি উৎস থেকে পাই :

১- ধর্মীয় উৎস

২- জাতীয় উৎস

৩- আন্তর্জাতিক উৎস

প্রথমত ধর্মীয় উৎস

এই উৎস দ্বারা বিশেষভাবে ইসলামী শরীআতকেই 'বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা মানবাধিকারের একটা মৌলিক উৎস হিসাবে গণ্য। লক্ষণীয় যে, কোন ধর্মই, তা আসমানী ধর্ম হোক বা মানব রচিত, মানবাধিকারের আলোচনা থেকে মুক্ত নয়।

ইসলামী শরীআতে বিদ্যমান মানবাধিকার নিয়ে আমাদের আলোচনা দু'টি পর্যায়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম পর্যায়ে আমরা আলোচনা করবো শরীআতে এই অধিকারগুলোর উৎস সম্পর্কে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করবো এই অধিকারগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া, এগুলোর প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং একে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সমকালীন ইসলামী চেষ্টা সাধনা সম্পর্কে।

তথ্যউৎস

১. আল-মাওসূআতুল আরাবিয়্যাতুল মায়সারা, ২খ, পৃ. ১০৮৩; মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল কাদের আর-রাবী, মুখতারুস-সিহাহ, পৃ. ৩৩৫।

২. বুতরুস আল-বুস্তানী, মুহীতুল মুহীত, পৃ. ৪৬০।

৩. ইবরাহীম ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মাদ আল-লাখমী, আল-মাওয়াফিকাত, ১খ, পৃ. ৮৮।

৪. মাওসূআ জামাল আব্দুন নাসের ফিল-ফিক্হ, প্রকাশক : আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুয়ূনিল ইসলামিয়া, ৯ম খণ্ড, কায়রো ১৩৯২ হি.,পৃ. ২৭৫-২৯৩।

৫. আল-মাদখালুল ফিকহী আল-আম, আয-যারকা, ৩খ, পৃ. ১০।

৬. আল-হাক্ব ওয়া মাদা সুলতানিদ দাওলাহ ফী তাকয়ীদিহি, আদ-দুরাইনী, পৃ. ১৯৩।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শরীআতে মানবাধিকারের উৎসসমূহ

প্রতিটি অধিকারেরই একটা উৎস থাকা অপরিহার্য, যা থেকে তা অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং মানুষের অধিকার থাকবে অথচ অধিকারের উৎস থাকবে না তা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অধিকারের উৎস হলো তার অস্তিত্ব। আর ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে সব সময় সংশ্লিষ্ট থাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য। দায়িত্ব ও অধিকার হলো একই কার্যক্রমের দুইটি দিক। আর দায়িত্বের উৎস হলো কোন আদেশ বা ঘটনা যা থেকে তা উদ্ভূত হয়। যেমন বিবাহ, তালাক বা শিশু সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে খোরপোষের দায়িত্ব। আর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনিবার্য দাবি হলো, তা পালন করার মাধ্যমে তা থেকে দায়মুক্ত হওয়া। এর কয়েকটা অংশ রয়েছে :

১– যার কারণে দায়িত্ব উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ অধিকারের প্রাপক

২– যার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অর্থাৎ অধিকারদাতা

৩– দায়িত্বের অকুস্থল, যে জিনিসের সাথে কর্মটি সংশ্লিষ্ট

৪– যে কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে অর্থাৎ দায়িত্ব পালন

৫– দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়া বা তা পালন করার বাধ্যবাধকতা

একটি ঋণের আঙ্গিকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : ঋণ গ্রহণকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার ঘাড়ে দায়িত্ব ন্যস্ত হলো। (২ নং ব্যক্তি) ঋণদাতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার পক্ষে দায়িত্ব ঘাড়ে এসেছে এবং অধিকারের প্রাপক। (১ নং) ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে সেই কাজ, যা করার দায়িত্ব অর্পিত হলো। (৪ নং) আর ঋণ পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা হলো দায়িত্ব। (৫ নং) অধিকারের সংজ্ঞার বিবরণে বলা হয়েছে, অধিকার হলো এমন একটা একক ও নিরংকুশ প্রাপ্য, যা শরীআত দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করে। তাই সকল অধিকারের জন্য শরীআতকেই মূল উৎস বিবেচনা করা হয়। বস্তুত ইসলামী ফিক্‌হের দৃষ্টিতে, শরীআত হচ্ছে অধিকারের উৎপত্তির পরোক্ষ উৎস। কারণ শরীআতই বিভিন্ন কাজ ও ঘটনাবলীর পরিণাম ও ফলাফল জন্ম দেয় ও নির্ধারণ করে। কাজেই কোন মানুষের এরূপ দাবি করার অবকাশ নেই যে, শরীআত স্বীকার না করলেও অমুক জিনিসের ওপর তার

www.pathagar.com

অধিকার রয়েছে। অধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে শরীআত কখনো কখনো অন্য কোন উপকরণের ওপর নির্ভর করা ব্যতিরেকেই সরাসরি অধিকার সৃষ্টি করে। যেমন বিভিন্ন ইবাদতের আদেশ দান, অপরাধ ও অন্যায় কাজে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও হালাল জীবিকার অনুমতি দান। এক্ষেত্রে শরীআতের প্রমাণাদিকে অধিকারের প্রত্যক্ষ কারণরূপে বিবেচনা করা হয়। অনুরূপ, শরীআত কখনো কখনো এমন কিছু কাজ থেকেও অধিকারের উৎপত্তি ঘটায়, যা জনগণ নিজেদের জীবদ্দশায় সম্পাদন করে, যেমন বেচাকেনা ও বিবাহ-শাদী ইত্যাদি।

শরীআত প্রণেতার সুস্পষ্ট বক্তব্য ব্যতীত ইসলামী শরীয়তে ও আধুনিক আইনে অধিকারের যেসব উৎস রয়েছে, তার জন্য আইনগত ঘটনাকে দায়ী করা যেতে পারে।

আইনগত ঘটনার সংজ্ঞা

যে ঘটনা থেকে কোন সুনির্দিষ্ট আইনগত ফলাফল জন্ম নেয় তাকে আইনগত ঘটনা বলা হয়। আইনগত ঘটনা দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : এই পৃথিবীতে নিছক প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত আইনগত ঘটনাকে প্রথম প্রকারের আওতাভুক্ত করা যায়। আইনজ্ঞদের ভাষায় এর নাম "প্রাকৃতিক ঘটনা"। এ ধরনের ঘটনার সাথে মানুষের ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন ভূমিকম্প, বৃষ্টিপাত, রমযানের চাঁদ, নামাযের ওয়াক্ত ও সূর্যের আবর্তন। পাগল, শিশু প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তিহীন ও অযোগ্য মানুষের কার্যকলাপ থেকে সংঘটিত ফলাফলও এই প্রকারের আওতাভুক্ত। এ ধরনের মানুষ অন্যের সম্পদ নষ্ট করার ফলে ক্ষতিপূরণের দায় অর্পিত হয়। অনুরূপ, জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনাকে এমন আইনগত ঘটনা বিবেচনা করা হয়, যা থেকে কিছু অধিকারের উৎপত্তি ঘটে। এসব অধিকারের প্রাপক হয়ে থাকে ক্ষেত্রভেদে উত্তরাধিকারীরা, নবজাতক, গর্ভস্থ সন্তান ও ওসিয়ত প্রাপক প্রমুখ। এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে এমন সব আইনগত ফলাফল জন্ম নেয়, যা থেকে শরীআত প্রণেতা কিছু অধিকার ও দায়দায়িত্ব উৎপাদন করে। অথচ এগুলোর সৃষ্টি বা উৎপাদনে মানুষের কোন ইচ্ছা থাকে না।

দ্বিতীয় প্রকার : যেসকল ঘটনা মানুষের কাজ থেকে সংঘটিত হয় এবং শরীআত তা থেকে বিভিন্ন ফলাফল উৎপাদন করে। এ সকল ঘটনা দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার : বস্তুগত কাজ

এ দ্বারা সেই সব কাজকে বুঝানো হয়, যা মানুষের দ্বারা সংঘটিত হওয়ার সাথে

www.pathagar.com

সাথে আইন প্রণেতা তা থেকে বিভিন্ন ফলাফল উৎপাদন করে। এটি আবার দুই ধরনের :

১– উপকারী কাজ : এমন কোন বস্তুগত কাজ, যা কোন এক পক্ষ থেকে সংঘটিত হয় এবং তা থেকে কোন লাভজনক ফল উৎপন্ন হয়। যেমন কোন আইনগত কারণ ছাড়া এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য একজন কিছু টাকা পেল। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি নিজেকে ঋণী ভেবে মহাজনের নিকট ঋণ পরিশোধ করলো। পরে জানা গেল, সে দায়গ্রস্ত ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে সে মহাজনের নিকট থেকে সেই টাকা ফেরত চাইতে পারে, যা তার প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেয়া হয়েছে এবং সে গ্রহণ করেছে।

২– ক্ষতিকর কাজ : এ দ্বারা সেই নিষিদ্ধ কাজকে বুঝানো হয়, যা অন্যের ক্ষতি সাধন করে। এ কাজের জন্য কর্তার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দেয়া বাধ্যতামূলক। কারো জান বা মালের ক্ষতিসাধন করে এমন যে কোন কাজই এর উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকার : আইনগত কাজ

এ দ্বারা বুঝায়, সুনির্দিষ্ট আইনগত ফলাফল উৎপাদনে মানুষের ইচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ দুই প্রকার :

১– শরীআত সম্মত উদ্যোগ, যা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে জন্ম নেয়, যেমন ওসিয়ত ও ওয়াকফ।

২– শরীআতসম্মত তৎপরতা, যা কোন আইনগত কাজ সম্পাদনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ইচ্ছার সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এটাই সেই চুক্তি যা দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

সারসংক্ষেপ : পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ দাঁড়ায়, ইসলামী আইন (ফিক্‌হ) ও সাধারণ আইনে অধিকারের উৎস হলো :

১– শরীআত বা আইন

২– চুক্তি

৩– একক ইচ্ছা

৪– উপকারী কাজ

৫– ক্ষতিকর কাজ

www.pathagar.com

অধিকারের প্রকারভেদ ও তার শ্রেণীবিন্যাস

অধিকারকে বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়ায় কয়েক প্রকারে বিন্যস্ত করা হয় : যথা অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রকারভেদ অনুসারে, অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ অনুসারে, অধিকারের বিলোপযোগ্যতা অনুসারে, অধিকার আদায়ের ক্ষমতা অনুসারে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার হস্তান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা অনুসারে। এর বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

প্রথম প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস

অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রকারভেদ অনুসারে অধিকারের প্রকারভেদ :

এই প্রক্রিয়া অনুসারে অধিকার ইমাম শাতিবী ব্যতীত অন্য সকল ফকীহের মতে চার প্রকার (এই চার প্রকারের বিববরণ একটু পরেই আসছে)। ইমাম শাতিবীর মতে, অধিকার তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ : (১) নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর হক বা অধিকার, যেমন ইবাদত, (২) আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার মিশ্রিত, কিন্তু আল্লাহর অধিকার অগ্রগণ্য, যেমন তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দাত। এক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকারের অগ্রগণ্যতার পেছনে শরীআতের উদ্দেশ্য হলো, ইদ্দাত পালন যেন নিশ্চিত হয়। (৩) উভয় অধিকার একত্র, কিন্তু বান্দার অধিকার অগ্রগণ্য। যেমন কিসাস। শাতিবী এ দ্বারা বান্দার নির্ভেজাল অধিকারের বিলোপ সাধন করেছেন। এ ব্যাপারে তার যুক্তি হলো, শরীআতের কোন বিধানই আল্লাহর অধিকার থেকে মুক্ত নয়। প্রত্যেক বিধিতেই আল্লাহর আনুগত্যের দিকটি রয়েছে। অনুরূপভাবে শরীআতের প্রত্যেক বিধিতেই বান্দার অধিকার নিহিত রয়েছে, চাই তা সে তাৎক্ষণিকভাবে বা বিলম্বে লাভ করুক।[১]

প্রথম প্রকার : আল্লাহর অধিকার

এটা হলো সেই অধিকার, যার সাথে জড়িত রয়েছে নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বার্থ ও সকল মানুষের উপকারিতা। এর বিরাট গুরুত্ব ও সর্বব্যাপী উপকারিতার কারণেই একে আল্লাহর অধিকার বলা হয়েছে। একে সর্বসাধারণের অধিকার বা সমাজের অধিকারও বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর অধিকার পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তার আওতাভুক্ত পাওয়া যায় :

১– আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত : যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং এই ঈমানের শাখা-প্রশাখা যথা নামায, রোযা, হজ্জ ও জিহাদ।

www.pathagar.com

২– এমন ইবাদত, যাতে আর্থিক দায় রয়েছে। যথা ফেতরা। দান-খয়রাত প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা হিসাবে এটা ইবাদত। আর এখানে দায় বহনের দিকটা হলো, এটি মানুষের নিজের পক্ষ থেকেও দেয়া ওয়াজিব, যাদের খোরপোষ সে বহন করে, তাদের পক্ষ থেকেও দেয়া তার ওপর ওয়াজিব।

৩– এমন আর্থিক দায়বদ্ধতা, যা ইবাদতের চেতনাসম্পন্ন। যেমন প্রাকৃতিক পানি দ্বারা সিঞ্চিত যমির ফসল থেকে উশর (এক-দশমাংশ যাকাত) দেয়ার বাধ্যবাধকতা। এখানে মূল সম্পত্তি যমির দিক দিয়ে আর্থিক দায় বিদ্যমান। আর ইবাদত রয়েছে উৎপন্ন ফসলের হিসাবে। তাই এই উশর যাকাতের খাতগুলোতে ব্যয়িত হয়।

৪– এমন আর্থিক দায়, যা শাস্তিমূলক। যেমন খারাজ (খাজনা)। এখানে আর্থিক দায় রয়েছে মূল সম্পত্তি যমির ভিত্তিতে, আর শাস্তি রয়েছে খারাজদাতার গুণবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। সে গুণবৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানের দখলকৃত যমির মালিকের কাছ থেকে চাষের অধিকার অর্জন। এ কারণে শুরুতে মুসলমানের ওপর খারাজ আরোপ করা বৈধ নয়। তবে সে যখন খারাজযোগ্য যমি ক্রয় করে তখন সে খারাজ দিতে বাধ্য।

৫– এমন অধিকার, যা বশ্যতা ও আনুগত্যের লক্ষণ হিসাবে প্রদানকারী বান্দার তদারকী ও ছত্রছায়ার ওপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন গনীমত ও খনিজ সম্পদের খুমুছ (এক-পঞ্চমাংশ)। কেননা জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর দীনের মর্যাদা রক্ষা ও তার বাণীকে সমুন্নত রাখার খাতিরে বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই এ কাজ করতে গিয়ে যা কিছু সম্পদ অর্জিত হবে, তার সবটুকু আল্লাহরই অধিকার। কিন্তু মহাবিজ্ঞানময় শরীআত প্রণেতা আল্লাহ স্বয়ং গনীমতকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ জিহাদকারীদের জন্য বরাদ্দ করে তাদের প্রতি করুণা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন, আর এক ভাগ রেখেছেন নিজের (সরকারী) অধিকার হিসাবে। এ অংশটি আমাদের আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ দেয়া জরুরী।

৬– সর্বতোভাবে শাস্তি হিসাবে গণ্য হুদূদ, যথা ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ, চুরি, ডাকাতি, ধর্মত্যাগ, মদপান ও সশস্ত্র বিদ্রোহের শাস্তি।

৭– আংশিক শাস্তি। যথা, হত্যাকারীকে নিহতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং সে যার জন্য ওসিয়াত করেছে, তাকে ওসিয়াত থেকে বঞ্চিত করা। এসব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা আল্লাহর অধিকার। কেননা হত্যাকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় নিহত ব্যক্তির কোন উপকার সাধিত হয় না। এই বঞ্চনাকে আংশিক শাস্তি নাম দেয়ার কারণ হলো, হত্যাকারী কোন দৈহিক আঘাত বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি অনুভব করে না। তাকে শুধু নতুন একটা সম্পত্তি অর্জন থেকে বিরত রাখা হয় এবং সেটা হলো নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অংশ।

৮– এমন অধিকার, যা অংশত ইবাদত এবং অংশত শাস্তি, যেমন কাফফারা আর্থিক জরিমানা। এটা আদায়ের দিক দিয়ে ইবাদত। কেননা কাফফারা হয় রোযার আকারে অথবা দাস স্বাধীন করার মাধ্যমে অথবা মিসকীনদেরকে আহার করানোর মাধ্যমে আদায় করা হয় এবং এগুলো সবই ইবাদত। আর এতে শাস্তির দিকটা প্রকাশ পায় বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে। কেননা কাফফারা শুধু সেই ব্যক্তির ওপরই ওয়াজিব হয়, যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে, যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করা, যিহার (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে) ও রমযানে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করা। এর নাম কাফফারা (আবরণ) রাখার কারণ হলো, এটি কৃত গুনাহকে আবৃত করে বা মোচন করে।

দ্বিতীয় প্রকার : নিরঙ্কুশভাবে বান্দার অধিকার (হক) তথা মানবাধিকার

যে ব্যক্তির অধিকার প্রমাণিত, তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ স্বার্থই হলো বান্দার অধিকার। বান্দার হক সাধারণত শাসন ব্যবস্থার (অর্থাৎ স্বাধীনতা, পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার ও সাম্য এই চার মূলনীতির) সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটা শুধু মানুষের পার্থিব স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট। মালিকী ইমাম আল-কারাফী[২] বলেছেন, বান্দার অধিকার বলতে তার স্বার্থই বুঝায়।[৩]

আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকারের মধ্যে পার্থক্য হলো, বান্দার অধিকার রহিত হওয়ার যোগ্য, উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য এবং একটির সাথে অন্যটিকে একীভূত করা চলে না। কিন্তু আল্লাহর অধিকার রহিত হওয়ার যোগ্য নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং একটির সাথে অপরটির একীভূতকরণ সম্ভব। অর্থাৎ একজন অপরাধী একই অপরাধ একাধিকবার করলেও (শাস্তি পাওয়ার পূর্বে) তার ওপর শরীআত নির্ধারিত হদ্দ বা শাস্তি একবারই কার্যকর হবে। বান্দার অধিকারের উদাহরণ প্রচুর। যথা অন্যের সম্পদ দখল নিষিদ্ধ হওয়া, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দিয়াত গ্রহণের অধিকার, বিনষ্টকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ গ্রহণের অধিকার, ক্রেতা কর্তৃক ক্রীত জিনিসের দখল পাওয়া ও বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত জিনিসের মূল্য হস্তগত করার অধিকার, স্ত্রী কর্তৃক

www.pathagar.com

স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ লাভের অধিকার এবং ঋণদাতা কর্তৃক খাতকের কাছ থেকে ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকার।

তৃতীয় প্রকার : আল্লাহর অধিকার ও বান্দার অধিকার একীভূত হওয়া এবং আল্লাহর অধিকারের অগ্রগণ্যতা

হানাফীগণ এর উদাহরণ হিসাবে পেশ করেন যেনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তিকে। কিন্তু শাফিয়ী ও হাম্বালীগণ এটিকে অপবাদের শিকার ব্যক্তির নিরংকুশ অধিকার বলে মনে করেন। কেননা আঘাত এসেছে তার সম্মানের ওপর। সুতরাং শাস্তি দেয়াটা তারই অধিকার।[৪]

হানাফীগণের অভিমত হলো, এ শাস্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অধিকার একীভূত হয়েছে। ব্যক্তির অধিকার তার মর্যাদা রক্ষার্থে ও তার ওপর থেকে কলংক মোচনার্থে শাস্তির আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই এটা অপবাদপীড়িত ব্যক্তির বিশেষ স্বার্থ ও অধিকার। পক্ষান্তরে এখানে আল্লাহর অধিকার এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, অপবাদের শাস্তি প্রয়োগে গোটা মানবজাতির সম্মান রক্ষা পায় এবং গোটা বিশ্বকে নৈরাজ্য থেকে ও সীমা লংঘন থেকে রক্ষা করা যায়। আর অপবাদে আল্লাহর অধিকারের অগ্রগণ্যতার যুক্তি হলো :

১– শাসক বা সরকার এ শাস্তির বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রয়োগকারী ও দাবি আদায়কারী কর্তৃপক্ষ, অপবাদ পীড়িত ব্যক্তি নয়।

২– অপবাদ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

৩– অপবাদে দণ্ডিত ব্যক্তি অপবাদের শিকারের উত্তরাধিকার লাভ করে না এবং এ শাস্তির কোন বিকল্প বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেই।

৪– বারবার এই অপরাধ করলেও তার শাস্তি একবারই প্রযোজ্য।

৫– কারো বৈধতা দানে এটা বৈধ হয় না।

এই শ্রেণীর অধিকারের আরো উদাহরণ হলো, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবার ইদ্দাত পালন। এখানে আল্লাহর অধিকার হলো বংশপরিচয়কে ভেজাল বা মিশ্রণ থেকে রক্ষা করা। এটা মানব সমাজের একটা সার্বিক উপকারিতাও বটে এবং তাকে অরাজকতা থেকে রক্ষা করার উপায়। এ ক্ষেত্রে বান্দার অধিকার হলো তার সন্তানদের বংশপরিচয়কে হারিয়ে যাওয়া থেকে বা অন্য কারো সাথে পরিচিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। আল্লাহর অধিকার বান্দার অধিকারের চেয়ে সর্বদাই অগ্রগণ্য।

www.pathagar.com

চতুর্থ প্রকার : যে ক্ষেত্রে বান্দার অধিকার ও আল্লাহর অধিকার মিলিত কিন্তু বান্দার অধিকার অগ্রগণ্য

এ শ্রেণীর অধিকারের উদাহরণ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যাকারীর কিসাস গ্রহণ। এখানে আল্লাহর অধিকারের দিকটি হলো, পৃথিবী থেকে অরাজকতা দূর করা এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ .

"কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭৯)।

এখানে বান্দার অধিকারের দিকটি হলো, নিহতের আপনজনদের মনের ক্ষোভ নিরসন, তাদের সান্ত্বনা ও তাদের ক্রোধ প্রশমন। এতে যেহেতু বান্দার হক প্রাধান্য লাভ করেছে, তাই তার জন্য অপরাধীকে ক্ষমা করা বা কিসাস রহিত করে অন্যভাবে বদলা বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা বৈধ। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার স্বত্ব বহাল থাকে। এটা বান্দার অধিকারের একটা বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস : অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুর প্রকারভেদ অনুসারে অধিকারের এই প্রকারভেদ–

এই শ্রেণীবিন্যাসে অধিকারের প্রকারভেদ এরকম : আর্থিক ও অ-আর্থিক অধিকার; নির্ধারিত ও অনির্ধারিত অধিকার, প্রত্যাহারযোগ্য ও অপ্রত্যাহারযোগ্য অধিকার। এগুলো নিম্নরূপ : প্রথমতঃ আর্থিক অধিকার ও অ-আর্থিক অধিকার[৫]

(ক) আর্থিক অধিকার

এ হচ্ছে অর্থ ও তার মুনাফা সংক্রান্ত অধিকার। এর উদাহরণ হচ্ছে, দ্রব্যাদির মালিকানা লাভের অধিকার, ব্যবহার ও ভোগের অধিকার, ভাড়া দেয়া দ্রব্যের মুনাফা আদায়ের অধিকার, ঋণ আদায়ের অধিকার, প্রতিবেশীর বিক্রিত জমি ক্রয়ে অগ্রাধিকার (শুফ্আ) ইত্যাদি। আর্থিক অধিকারগুলো দুই প্রকারের।

প্রথম প্রকার

ব্যক্তিগত অধিকার : এ হচ্ছে শরীআত নির্ধারিত এমন অধিকার, যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির ওপর প্রয়োগের জন্য দেয়া হয়। ব্যক্তিগত অধিকারের বিশ্লেষণে গেলে আমরা দুটো জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাই।

১– অধিকার প্রাপকের স্বার্থের অনুকূলে কোন কাজ করা। যেমন বিক্রিত জিনিস হস্তগত করার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকার এবং মূল্য হস্তগত করার ব্যাপারে বিক্রেতার অধিকার। বিক্রেতার অধিকার রয়েছে তার কাছে মূল্য হস্তান্তরের জন্য

www.pathagar.com

ক্রেতাকে তাগিদ দেয়া। অনুরূপ ক্রেতারও অধিকার রয়েছে বিক্রেতাকে ক্রেতার নিকট বিক্রিত মাল হস্তান্তর করতে তাগিদ দেয়া।

২– অধিকার প্রাপকের স্বার্থে কোন কাজ করা থেকে সংশ্লিষ্ট লোককে বিরত রাখা। যথা আমানতকারী কর্তৃক আমানত গ্রহণকারীকে আমানতকৃত জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করার অধিকার।

দ্বিতীয় প্রকার

দ্রব্যসামগ্রী সংক্রান্ত অধিকার : শরীআত কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর ওপর প্রদত্ত অধিকার। যেমন মালিকানা অধিকার। মালিকের অবাধ অধিকার রয়েছে তার মালিকানাধীন দ্রব্যকে ব্যবহার করার, লাভজনক কাজে খাটানোর ও তার যে কোন রদবদল ঘটানোর। এ অধিকার কোন ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট দ্রব্যের মধ্যকার সম্পর্কের নাম। আর ব্যক্তিগত অধিকার দুই ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের নাম।

(খ) অ-আর্থিক অধিকার

এ দ্বারা সেইসব অধিকার বুঝায়, যা অর্থ-সম্পদ নয় এবং অর্থ-সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়, যেমন শিশুর ওপর অভিভাবকের অধিকার, কিসাসের অধিকার, শিশু পালন ও পরিচর্যার (হিদানাত) অধিকার, শরীআত সম্মত কারণে তালাকের অধিকার এবং রাজনৈতিক ও জন্মগত অধিকার, যেমন ভোটাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার।

নির্ধারিত ও অনির্ধারিত অধিকার[৬]

(ক) নির্ধারিত অধিকার

নির্ধারিত অধিকার হলো কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাথে যুক্ত অধিকার, চাই তা কোন বস্তু হোক কিংবা উপকারিতা হোক। এ অধিকার প্রাপকের ক্ষমতা রয়েছে শরীআতের দাবি অনুসারে অধিকার প্রয়োগ করার। নির্ধারিত অধিকারের একটা উদাহরণ হলো মালিকানা অধিকার বা স্বত্বাধিকার, ভাড়া দেয়া বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার, দাম্পত্য অধিকার ও চলাচলের অধিকার।

(খ) অনির্ধারিত অধিকার

এটি উপরোল্লিখিত অধিকারের বিপরীত। সুতরাং অনির্ধারিত অধিকার হলো যা কোন বস্তুর সাথে যুক্ত নয়, বরং ক্ষমতাবলে অর্জিত।[৭] শরীআত কোন ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেয়, অতঃপর সে তার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট পন্থায়

www.pathagar.com

তাতে হস্তক্ষেপ করে। যেমন প্রতিবেশীর বিক্রিত জমিতে শরীআত প্রদত্ত ক্রয়ে অগ্রাধিকার (শুফ'আ)। প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে বিক্রিত জমির ক্রেতার ওপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে যে মূল্য দিয়ে সে তা দখলে নিয়েছে তা দিয়ে জমির মালিকানা হস্তগত করার। যে ব্যক্তির জন্য এই অধিকার অনুমোদিত, হানাফী মতানুসারে বা অধিকাংশ আলেমের মতে, তাকে শরীক ও নিকটতর প্রতিবেশী হতে হবে।[৮] কাজেই প্রতিবেশীর জমি ক্রয়ের এই অগ্রাধিকার কেবল শরীকের জন্যই নির্ধারিত। শরীকের প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে জমির মালিকানা হস্তগত করার ও ক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার। সে বহিরাগত ক্রেতার চেয়ে জমির অগ্রগণ্য ক্রেতা। এ অধিকার প্রয়োগ না করার এখতিয়ারও তার রয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার, যথা নির্বাচন ও মনোনয়ন লাভের অধিকার এ জাতীয় অধিকারের একটি উদাহরণ।

প্রত্যাহারযোগ্য ও অপ্রত্যাহারযোগ্য অধিকার[৯]

(ক) প্রত্যাহারযোগ্য অধিকার

এটা হচ্ছে সেই অধিকার, যার প্রাপক তা ভোগ করতে না চাইলেও তাতে কোন প্রভাব ফেলে না, বরং যে বস্তুর সাথে অধিকারটি যুক্ত তা পূর্ববৎ বহাল থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, প্রত্যাহারযোগ্য অধিকার প্রয়োগ না করলেও তা যে অবস্থায় অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। প্রতিবেশীর জমি ক্রয়ের অগ্রাধিকার (হক্কুশ শুফ'আ) এর উদাহরণ। এ অধিকারের প্রাপক তার অধিকার ত্যাগ করলেও তা ঐ অধিকার সংক্রান্ত বিধিতে কোন পরিবর্তন সূচিত করে না। কেননা ক্রেতা ক্রেতাই থেকে যায় এবং জমির মালিকই থেকে যায়। তাঁর হাত গুটিয়ে নেয়াতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অনুরূপ, কোন জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেউ যদি তার পছন্দ প্রয়োগের এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তবে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বহাল থাকবে এবং চুক্তির প্রতিপক্ষের ওপর তার প্রভাব পড়বে না।

(খ) অপ্রত্যাহারযোগ্য অধিকার

এটা এমন অধিকার যে, তার মালিক তা থেকে হাত গুটালে তার ওপর এর প্রভাব পড়ে। এর উদাহরণ হলো কিসাস বা খুনের বদলা নেয়ার অধিকার। কিসাসের অধিকার ইচ্ছাকৃত খুনী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে কিসাসের অধিকারী ব্যক্তির দিক থেকে তার জানকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। কেননা শরীআত প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ও শর্ত অনুসারেই সে খুনের বদলা নেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু

www.pathagar.com

কেননা একমাত্র ইসলামী শরীআতই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে– মহান সৃষ্টিকর্তা তার বান্দাদের প্রতি যে অসীম দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন তারই ভিত্তিতে। আর ইসলামী শরীআতই পার্থিব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে ও উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়। যেমন বিশেষজ্ঞ চিন্তাবিদগণ বলেন, ইসলামী শরীআত বিশ্বপ্রকৃতির সকল জড়বস্তু ও মানবীয় বিবেকবুদ্ধির সাথে একই সাথে সমন্বয় বিধান করে। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যবর্তী একটি ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা। কাজেই এর একটি অপরটির ওপর হস্তক্ষেপ করে না ও আগ্রাসন চালায় না। এর ফলে মানব জীবন পৃথিবীতে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ তাআলাকে কখনো ক্রোধান্বিত করে না এবং তা তার সুসমন্বিত কাঠামোর ওপর চিরদিন টিকে থাকে।

মানবাধিকার সংরক্ষণে ও তার তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের ভূমিকা নিশ্চিত করা ও এই ভূমিকা নতুন করে প্রত্যয়ন করার লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত বিশ্ব ইসলামী পরিষদ, "আল- মুতামার আল-আলামিল ইসলামী" গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ তারিখে "ইসলামের মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা" প্রচার করে। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে মানবাধিকারের ধারাসমূহের যে ভিত্তি ও উৎস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই এ ঘোষণার আওতাভুক্ত।

ঘোষণার ভূমিকা

মানবাধিকারের ইসলামী উৎসের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই ঘোষণা উপস্থাপন করছি। আর এই উৎসকে আনুষ্ঠানিক, মৌলিক ও প্রত্যক্ষ বলে গণ্য করা যায়। কেননা এটা আমাদের কাছে কুরআন ও হাদীসের মধ্য দিয়ে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

বিশ্ব ইসলামী পরিষদ ইসলামী শরীআতের অলংঘনীয় উৎস কুরআন ও হাদীসের অনুসরণে ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের ধারা-উপধারাসমূহ পর্যালোচনা করে মানবাধিকারের এই ঘোষণা প্রণয়ন করেছে।

ইসলামের মানবাধিকার সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক ঘোষণা মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁরা তাঁদের এই মহান সাধনায় ব্রতী হন হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর শুভ সূচনা উপলক্ষে। এ ঘোষণা প্রচারিত হয় উল্লিখিত তারিখে প্যারিস থেকে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে :

৪—

www.pathagar.com

"দেশ ও জাতি নির্বিশেষে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম জনতা, আমাদের পবিত্র মহাগ্রন্থের আলোকে মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্রান্ত নির্ভুল ও সঠিক দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে, আল্লাহর দিকে আহ্বানের পতাকাবাহী আমরা মুসলমানরা, দীন ইসলামের নামে পঞ্চদশ হিজরীর সূচনালগ্নে পবিত্র কুরআন ও মহান সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত এই ঘোষণা প্রচার করছি।"

এই অধিকারগুলো তার বর্তমান অবয়বে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এর কোন অংশ কখনো রহিত, পরিবর্তিত ও স্থগিত বা বর্জনযোগ্য নয়। এগুলো এমন অকাট্য অধিকার, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। তাই কোন মানুষের, চাই সে যে-ই হোক না কেন, এগুলিকে স্থগিত করা বা এর ওপর কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় বা সমাজের ইচ্ছায়, তার প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানে, চাই তার প্রকৃতি যেমনই হোক এবং তার কর্তৃক ক্ষমতা যতই প্রবল হোক, এ অধিকারগুলোর স্বতন্ত্র সংরক্ষিত অস্তিত্ব কিছুতেই ক্ষুণ্ন হবে না। এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায় ও পথ।

১– ধারা : এ সমাজে সকল মানুষ সমান। জাতীয়তা, বংশ, গোত্র, লিংগ, বর্ণ, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য নেই।

২– ধারা : এ সমাজে সমতাই অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যভার প্রাপ্তির ভিত্তি। আর মানুষের জন্মের উৎস এক হওয়াই এ সমতার ভিত্তি ও কারণ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى.

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি" (আল-হুজুরাত : ১৩)।

আর মহান আল্লাহ মানুষকে পরম সম্মানে ভূষিত করেছেন এই বলে :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً.

"আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (আল-ইসরা : ৭০)।

৩– ধারা : এ সমাজে মানুষের স্বাধীনতা তার জীবনের সার্থকতারই সমার্থক। সে

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করুক, স্বাধীন পরিবেশে নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটাক, দমন, পরাধীনতা, অবমাননা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত অবস্থায় বেড়ে উঠুক, এটা এই সমাজ নিশ্চিত করবে।

৪– ধারা : পরিবার এই সমাজের ভিত্তি। সমাজ তাকে সর্বাত্মক সম্মান ও নিরাপত্তা দেবে এবং তার স্থিতি ও উন্নয়নের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করবে।

৫– ধারা : এই সমাজে আল্লাহর রচিত আইনের সামনে শাসক ও শাসিত সমান। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য থাকবে না।

৬– ধারা : এ সমাজে শাসন ক্ষমতা একটি আমানত, যা শাসকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে শরীআতের ইপ্সিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শরীআতের নির্ধারিত পদ্ধতিতেই বাস্তবায়িত হয়।

৭– ধারা : এই সমাজের সকলে বিশ্বাস করে, একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক, মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর সকল সৃষ্টির ব্যবহারের উপযোগী। সেগুলো তার সেবায় ও উপকারার্থে নিয়োজিত। এগুলো তাঁর কৃপার দান, এতে কারো কোন অগ্রাধিকার নির্ধারিত নেই এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে আল্লাহর এই দান থেকে তার ন্যায্য অংশ লাভ করার।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوتِ وَمَا الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী করেছেন" (আল-জাছিয়া : ১৩)।

৮– ধারা : এই সমাজে সমগ্র উম্মাহর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা ও সংহত করার নীতিমালা নির্ধারিত রয়েছে এবং যে ক্ষমতাবলে সেই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হবে, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে পরামর্শের ভিত্তিতে।

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

"তাদের সামষ্টিক কার্যকলাপ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে" (আশ্-শূরা : ৩৮)।

৯– ধারা : এ সমাজে যাবতীয় পরিপূরক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ও সুলভ থাকবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব বহন ও পালন করতে পারে। অতঃপর ইহকালে জনগণের সামনে ও পরকালে তার স্রষ্টার সামনে জবাবদিহি করবে।

www.pathagar.com

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে"।[১]

১০- ধারা : এ সমাজ আদালতের সামনে শাসক ও শাসিত একই কাতারে সমান মর্যাদায় দাঁড়াবে, এমনকি বিচারানুষ্ঠান পর্যায়ের যাবতীয় কার্যকলাপেও।

১১- ধারা : এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বিবেকস্বরূপ। তার অধিকার রয়েছে, যে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে সমাজের পক্ষ থেকে মামলা রুজু করার। অন্যদের কাছ থেকেও তার সাহায্য ও সমর্থন চাওয়ার অধিকার রয়েছে। অন্যদেরও কর্তব্য তাকে সাহায্য করা এবং তার ন্যায়সংগত দাবিতে তার বিরোধিতা না করা।

১২- ধারা : এ সমাজ সকল ধরনের আগ্রাসন প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্বাধীনতা, সম্মান ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহর আইন মানুষকে যে সকল অধিকার দিয়েছে, তার অনুগত থেকে, তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়ে ও তা সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে উক্ত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে। ইসলাম সারা বিশ্বের জন্যই এ অধিকারগুলো ঘোষণা করছে।

ঘোষণার ভাষ্য

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইসলামের মানবাধিকার (১)

১- জীবনের অধিকার

(ক) মানুষের জীবন পবিত্র। তার ওপর আক্রমণ ও আগ্রাসন চালানো কারো জন্য বৈধ নয়।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

"যে ব্যক্তি কোন হত্যাকাণ্ড বা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি তাকে রক্ষা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করলো" (আল-মাইদা : ৩২)।

www.pathagar.com

শরীআত প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত এবং শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থা ব্যতীত এই অধিকারের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

(খ) মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক সত্তা একটি সুরক্ষিত জিনিস। তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে শরীআত একে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করে। মানুষের দেহ উভয় অবস্থায় সম্মানজনক ও বিনম্র ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে কাফন পরায়, তখন সে যেন উত্তমরূপে কাফন পরায়" (আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, নং ৩১৪৮)। তার শরীরের গোপনীয় অংশ ও ব্যক্তিগত দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখা ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা যা করেছে তার কাছেই চলে গেছে" (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৪০, বুখারী হাদীস নং ১৩৯৩)। অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করার স্থানেই পৌঁছে গেছে।

২– স্বাধীনতার অধিকার

(ক) মানুষের স্বাধীনতা তার জীবনের মতই পবিত্র। এটা তার জন্মগ্রহণকালীন প্রথম স্বাভাবিক অবস্থা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "প্রত্যেক শিশুই স্বাভাবিক (স্বাধীন) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২২৯)। এ স্বাধীনতা আজীবন তার সাথে থাকবে ও অব্যাহত থাকবে। এর ওপর কোন আঘাত, আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছিলেন, "তোমরা কখন মানুষকে পরাধীন করলে? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় প্রসব করেছিল।"[২]

ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী। একমাত্র শরীআতের অনুমতি বা নির্দেশ ব্যতীত এবং তার অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত এই স্বাধীনতা খর্ব করা বৈধ নয়।

(খ) কোন জাতির জন্য অপর জাতির স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বা আগ্রাসন চালানো বৈধ নয়। যে জাতির ওপর আগ্রাসন চালানো হয় সকল সম্ভাব্য উপায়ে আগ্রাসন প্রতিহত করা ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার অধিকার তার রয়েছে।

টীকা : শুধু 'অধিকার' শব্দটি উল্লেখ করলাম, 'দায়িত্ব' শব্দটি উল্লেখ করলাম না। কেননা যে জিনিস কারো জন্য অধিকার, সে জিনিস অন্যের জন্য দায়িত্ব। যেমন প্রজার অধিকার শাসকের দায়িত্ব, স্ত্রীর অধিকার স্বামীর কর্তব্য ইত্যাদি। যেহেতু ইসলামে মানবাধিকার স্থান ও সম্পর্কের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের জন্যই তাই যা একজনের জন্য অধিকার অন্যজনের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য (গ্রন্থকার)।

www.pathagar.com

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ.

"যে ব্যক্তি অত্যাচারের শিকার হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই" (আশ-শূরা : ৪১)।

যে জাতি নিজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তার সাহায্য করা সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজের কর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যা পালনে কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَاَتَوُا الزَّكوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তাদেরকে আমি পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাস করার ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে" (আল-হাজ্জ : ৪১)।

৩– সমতার অধিকার

(ক) শরীআত তথা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "একজন অনারবের ওপর একজন আরবের, একজন আরবের ওপর অনারবের, কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের সততা ও আল্লাহভীতি ব্যতীত আর কোন ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা.-এর ভাষণ থেকে, মুসনাদ আহমাদ, ৫/৪১১; আবু দাউদ ৪/১৩২)।

এ অধিকার বাস্তবায়নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যের কোন অবকাশ নেই। রসূলুল্লাহ সা. বলেন, "মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম" (আবু দাউদ, হুদূদ, হা-৪৩৭৩)।

অধিকার সংরক্ষণেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদাভেদের অবকাশ নেই। আবু বকর রা. খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, জেনে রাখো! যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, আমি যতক্ষণ তার অধিকার আদায় করে দিতে না পারবো, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, তার কাছ থেকে আমি যতক্ষণ অধিকার আদায় করতে না পারবো, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল।"

(খ) মানবীয় মূল্যায়ন ও সম্মানে মানুষ সমান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সা. বলেছেন, "তোমাদের সবাই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী" (আবু দাউদ, আদাব, বাব তাফাখুর, ৪/৩৩১)। মর্যাদার তারতম্য হবে কেবল কাজ দ্বারা। সূরা আহকাফের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

"সকল মানুষের জন্য নিজ নিজ কাজ অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে।" কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির চেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্মুখীন করা যাবে না। হাদীস : "মুসলমানদের রক্তের বদলা সমান হারে নেয়া হবে" (ইবনে মাজা, ২/৮৫৯; আবু দাউদ, ৩/৮০ নং ২৭৫১)। যদি কোন ধ্যানধারণা, মতাদর্শ, আইন বা পরিস্থিতি জাতীয়তা, বর্ণ, বংশ, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের অবকাশ সৃষ্টি করে, তবে তা ইসলামের এই সর্বব্যাপী মূলনীতির বিপরীত হবে।

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে সমাজের বস্তুগত সম্পদসমূহ থেকে সমান কর্মের সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে উপকৃত হওয়ার। কর্মের এই সুযোগের ব্যবহারে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী সুবিধা পাবে না।

فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ.

"অতএব তোমরা পৃথিবীর দিকে দিকে চলাফেরা করো এবং তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে আহার করো" (সূরা মুলক, ১৫)।

যতক্ষণ প্রদত্ত শ্রম পরিমাণে ও মাপে সমান থাকবে এবং কৃত কাজ পরিমাণে ও মাপে এক থাকবে, ততক্ষণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারিশ্রমিকে ভেদাভেদ ও তারতম্য করা বৈধ হবে না।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভালো কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে কণা পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখবে" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)।

৪- ইসলামী আইনে বিচার লাভের অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে অন্য আইন ব্যবস্থা ব্যতীত ইসলামী শরীআতের অধীন বিচার প্রার্থনা করার। আল্লাহ বলেছেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

www.pathagar.com

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও, তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে নিয়ে যাও" (সূরা নিসা : ৫৯)।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

"তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তার ভিত্তিতে ফায়সালা করে দাও, তাদের খেয়াল-খুশীমত চলো না" (সূরা মাইদা : ৪৯)।

(খ) কোন ব্যক্তির ওপর কোন প্রকার যুলুম হলে তা প্রতিহত করার অধিকার তার রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ.

"আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না। তবে যার ওপর যুলুম হয়েছে তার কথা ভিন্ন" (সূরা নিসা : ১৪৮)।

এটাও তার দায়িত্ব যে, অন্য কারো ওপর যুলুম হলে সাধ্যমত তা প্রতিহত করবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের উচিত যালেম কিংবা মাযলুম উভয় অবস্থায় তার ভাইকে সাহায্য করা। যালেম হলে তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা, মযলুম হলে তাকে সাহায্য করা উচিত" (মুসনাদ আহমাদ, ৩/৩২২৪)।

ব্যক্তির অধিকার রয়েছে কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, যা তার প্রতি ইনসাফ করবে, তাকে রক্ষা করবে এবং তার ওপর কৃত যুলুম ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত করবে। মুসলিম শাসকের কর্তব্য এরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা ও সেই কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। হাদীসে রয়েছে : "শাসক হচ্ছে ঢালস্বরূপ, তার ছত্রছায়ায় থেকে যুদ্ধ করা হয় ও আত্মরক্ষা করা হয়" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল ইমাম জুন্নাতুন)।

(গ) ব্যক্তির এটা অধিকার এবং কর্তব্য, অন্য যে কোন ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা ও দলের অধিকার রক্ষা করা এবং এ কাজে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশা করা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী কে জানাবো না? যে ব্যক্তি তলবের আগেই সাক্ষ্য দেয়" (আবু দাউদ : ৩/৩০৬, কিতাবুল আকদিয়া)। অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে আহ্বান করা ছাড়াই শুধু আল্লাহর পুরস্কারের আশায় স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দেয়া।

(ঘ) কোন অজুহাতেই ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হরণ করা বৈধ নয়। "নিশ্চয়ই অধিকারের দাবিদারের কিছু বক্তব্য রয়েছে" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিকরাদ, বাব ইসতিকরাদিল ইবিল)। "যখন তোমার সামনে দুই পক্ষ

www.pathagar.com

(বাদী-বিবাদী) আসন গ্রহণ করে, তখন প্রথম জনের বক্তব্য যেমন শুনেছ তেমন দ্বিতীয় জনের কথা না শোনা পর্যন্ত কোনক্রমেই ফায়সালা করো না। কেননা এটাই তোমার কাছে বিচার্য বিষয় সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য অধিকতর উপযোগী পন্থা" (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৮২)।

(ঙ) শরীআত বিরোধী কোন আদেশ মেনে নিতে কোন মুসলমানকে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই। কোন মুসলমানকে যে ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজের আদেশ দেয় সেই আদেশদাতা যেই হোক, তার মুখের ওপরই 'না' বলা মুসলমানের কর্তব্য। মহানবী (সা) বলেন, "যখন তাকে গুনাহর কাজের আদেশ দেয়া হয়, তখন তার জন্য তা শোনাও বৈধ নয়, তার আনুগত্য করাও বৈধ নয়" (ইবনে মাজা, জিহাদ, হাদীস নং ২৮৬৪)।

মুসলিম সমাজ ও দলের কাছে তার অধিকার রয়েছে, সত্যের প্রতি একাত্মতার স্বার্থে তারা অন্যায় আদেশ প্রত্যাখ্যানে তাকে সাহায্য করবে। মহানবী (সা) বলেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর যুলুমও করবে না, তাকে অসহায়ও ছেড়ে দিবে না" (আবু দাউদ, আদাব, বাবুল মুওয়াখাত, ৪/২৭৩)।

৫– ন্যায়সংগতভাবে বিচার লাভের অধিকার

(ক) অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ মূলত নিরপরাধ। "প্রকাশ্যে অপরাধকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের সবাই নির্দোষ" (বুখারী, আদাব, বাব সিতরিল মুমিন আলা নাফসিহি)। এমনকি একটি ন্যায়বিচারক আদালতের সামনে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলেও সে সর্বদাই নির্দোষ ও নিরপরাধ বিবেচিত হবে।

(খ) সুস্পষ্ট আইনী ভাষ্য ছাড়া কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

"একজন রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাব দিতাম না" (সূরা ইসরা : ১৫)।

অনিবার্যভাবেই ইসলাম সম্পর্কে জানা থাকে এমন বিষয়ে কোন মুসলমানের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা যাবে না। তবে যখন অজ্ঞতা প্রমাণিত হবে তখন তা বিবেচনায় নিতে হবে। সন্দেহ দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ.

"তোমরা যা ভুল করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই, তবে স্বেচ্ছায় যা কিছু করেছ তা স্বতন্ত্র" (সূরা আহযাব : ৫)।

www.pathagar.com

(গ) কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না, কোন অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না একটা পূর্ণাংগ আদালতের সামনে অপ্রত্যাহারযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার অপরাধী হওয়া প্রমাণিত হয়।

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا.

"কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তদন্ত করে নিশ্চিত হও" (সূরা হুজুরাত : ৬)।

وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"ধারণা-অনুমান সত্যের অভাব পূরণ করে না" (সূরা আন্-নাজম : ২৮)।

(ঘ) শরীআত অপরাধের যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তাতে কোন অবস্থাতেই ছাড় দেয়া যাবে না।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا.

"এ হচ্ছে আল্লাহর সীমা, কাজেই তোমরা এটা লংঘন করো না" (সূরা আল-বাকারা : ২২৯)।

যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা বিবেচনা করে শাস্তি মওকুফ করা শরীআতের অন্যতম মূলনীতি। "যতদূর সম্ভব, মুসলমানদের শাস্তি প্রতিহত কর। যদি তাকে রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ থাকে তবে রেহাই দাও" (ইবনে মাজা, ২/৮৫০, তিরমিযী ২/৪৩৯)।

(ঙ) কোন মানুষকে অন্য মানুষের অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

"কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন করবে না" (সূরা আল-ইসরা : ১৫)।

আর প্রত্যেক মানুষ আলাদাভাবে নিজের কাজের জন্য দায়ী।

وكُلُّ أَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ.

"প্রত্যেক মানুষ নিজের উপার্জিত গুনাহর হাতে যিম্মী" (সূরা তূর : ২১)।

কোন অবস্থাতেই অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারীদের পর্যন্ত গড়াতে দেয়া বৈধ নয়।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا الظّٰلِمُوْنَ.

www.pathagar.com

"সে বললো, আল্লাহর আশ্রয় চাই, যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমরা ধরতে পারি না। তাহলে তো আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো" (সূরা ইউসুফ : ৭৯)।

৬– শাসকের অত্যাচার থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। তার কোন কাজ বা অবস্থার ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার কারো নেই। অনুরূপ এমন শক্তিশালী কারণ ছাড়া কাউকে কোনরূপ দোষারোপ করা যাবে না যে কারণ তার প্রতি আরোপিত অভিযোগের সাথে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেয়।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

"আর যারা মুমিন নারী ও পুরুষদের ওপর তারা যা করেনি, তার অভিযোগ আরোপ করে, তারা সুস্পষ্ট অপবাদ ও গুনাহে লিপ্ত হয়" (সূরা আল-আহযাব : ৫৮)।

৭– দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার

(ক) অভিযুক্ত তো দূরের কথা, অপরাধীকেও দৈহিকভাবে নির্যাতন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।" অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যে অপরাধ করেনি, সেই অপরাধের স্বীকারোক্তি করাতে বাধ্য করাও বৈধ নয়। আর বল প্রয়োগমূলক পন্থায় যা কিছু কেড়ে নেয়া হয়, তা বাতিল। "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমার উম্মতকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ভুল-ত্রুটি থেকে এবং যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা থেকে" (ইবনে মাজা, ১/৬৫৯)।

(খ) কোন ব্যক্তির অপরাধ যত গুরুতরই হোক এবং আইন অনুযায়ী তার যে শাস্তিই নির্ধারিত হোক, তার মানবোচিত সম্মান ও মানবাধিকার সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে।

৮– সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার

ব্যক্তির সম্মান ও সুনাম একটা পবিত্র জিনিস, যা অলংঘনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন এই মাসে এই শহরে পবিত্র" (ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৫৫)। তার গোপন তথ্য খোঁজা এবং তার ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا.

"তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একজন অপরজনের গীবত করো না" (সূরা হুজুরাত : ১২)।

وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَبِ.

"তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করো না ও একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ভূষিত করো না" (সূরা হুজুরাত : ১১)।

৯– নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার

(ক) প্রত্যেক মজলুম ও নির্যাতিত মুসলমানের অধিকার রয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেখানে সে নিরাপদ মনে করবে, আশ্রয় প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক নির্যাতিতের জন্য ইসলাম এ অধিকার নিশ্চিত করে, চাই তার জাতীয়তা, বিশ্বাস ও বর্ণ যাই হোক। ইসলাম মুসলমানদের ওপর নির্যাতিতের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করে যে, যখনই সে তাদের কাছে আশ্রয় চাইবে, তাকে আশ্রয় দেয়া হবে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ.

"কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায় তবে তাকে আল্লাহর বাণী শ্রবণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও" (সূরা আত্-তাওবা : ৬)।

(খ) মক্কা শরীফে মসজিদুল হারাম সকল মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কোন মুসলমানকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়া যাবে না।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أمِنًا.

"যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ" (সূরা আল ইমরান : ৯৭)।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا.

"স্মরণ করো, যখন আমি পবিত্র ঘরকে মানুষের নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল বানিয়েছি" (সূরা আল-বাকারা : ১২৫)।

سَوَاءً الْعكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ.

"এখানে স্থায়ী বাসিন্দা ও অস্থায়ী বাসিন্দা সবাই সমান" (সূরা হজ্জ : ২৫)।

www.pathagar.com

১০– সংখ্যালঘুর অধিকার

(ক) সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার কুরআনের নিম্নোক্ত সর্বব্যাপী ঘোষণা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে :

لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ.

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৬)।

(খ) সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার ও তাদের পারিবারিক অধিকার : তারা যখন ইসলামী সরকারের নিকট বিচারপ্রার্থী হবে, তখন তাদের এসব অধিকারের বিচার-ফায়সালা ইসলামী আইন অনুসারেই করা হবে।

فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ.

"তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে দিন অন্যথায় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তবে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, তবে তা ন্যায়সংগতভাবে করে দিন" (সূরা আল-মাইদা : ৪২)।

ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন না হলে তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিধির শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ م بَعْدِ ذٰلِكَ.

"তারা কিভাবে তোমার নিকট বিচারপ্রার্থী হবে, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান। তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়" (সূরা আল-মাইদা : ৪৩)

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ.

"ইনজীলের অনুসারীদের ইনজীল অনুসারে বিচার ফায়সালা করা উচিত" (সূরা আল-মাইদা : ৪৯)।

১১– জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার

(ক) একটি জাতির জীবনে জনগণের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট যত

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তা জানার অধিকার জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। সেসব কর্মকাণ্ডে তার শক্তি-সামর্থ্য ও মেধা-যোগ্যতা অনুসারে অংশগ্রহণ করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা পরামর্শের বিধান বাস্তবায়নের জন্যই তা প্রয়োজন।

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

"তাদের সামগ্রিক তৎপরতা পরমর্শের ভিত্তিতে চলবে" (সূরা আশ্-শূরা : ৮৭)।

জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির আইনানুগ শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সরকারী পদ ও চাকরী লাভের অধিকার রয়েছে। কোন ধরনের বংশগত, জাতিসত্তাগত বা গোষ্ঠীগত বিবেচনায় এ অধিকার বিলুপ্ত বা ক্ষুণ্ন হবে না। "মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা সমান। তারা তাদের পরস্পরের ওপর কর্তৃত্বশীল। তাদের নগণ্যতম ব্যক্তিও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার অধিকার রাখে" (ইবনে মাজা, কিতাবুদ দিয়াত, ২/৮৯৫)।

(খ) পরামর্শ হচ্ছে শাসক ও জাতির মাঝে সম্পর্কের সেতুবন্ধন। এই মূলনীতির বাস্তবায়নের দাবিতে জাতির অধিকার রয়েছে স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের শাসক নির্বাচনের। শাসকগণ যখন শরীআত থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের সমালোচনা করা ও বরখাস্ত করার অধিকারও জনগণের রয়েছে। খেলাফত লাভের পর প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর রা. বলেন, "আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নই। তোমরা যদি দেখো, আমি ন্যায়ের ওপর আছি তাহলে আমাকে সাহায্য করো। আর যদি দেখো, আমি বাতিলের ওপর আছি তাহলে আমাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিও। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হই, তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য থাকবে না।"

১২- স্বাধীনভাবে চিন্তা বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকার

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি, শরীআতের সীমালংঘন না করার শর্তে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, বিশ্বাস করা এবং নিজের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকারী। তার এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে বা অধিকারকে বিলুপ্ত করতে পারে না। তবে কোন বাতিল বা অন্যায় জিনিস প্রচার করা যাবে না। কোন অশ্লীল বিষয় বা জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী বিষয় প্রচার করা যাবে না।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

www.pathagar.com

وَالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ إِلاَّ قَلِيْلاً. مَّلْعُوْنِيْنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوْا أُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً.

"মুনাফিকরা, অন্তরে যাদের রোগ আছে তারা এবং যারা মদীনায় গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা যদি এসব থেকে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের ওপর পরাক্রমশালী করবো। তারপর তারা এ শহরে আপনার প্রতিবেশীরূপে অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে। আর তাও করতে পারবে অভিশপ্ত অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরপাকড় করা হবে এবং ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে" (সূরা আহযাব : ৬০-৬১)।

(খ) সত্যের সন্ধানে স্বাধীন চিন্তা-গবেষণা শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যও বটে।

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا.

"বলো, আমি তোমাদের একটি মাত্র উপদেশ দেই যে, তোমরা আল্লাহর জন্য দুই দুইজন করে ও একজন একজন করে দাঁড়াও, তারপর চিন্তা করো" (সূরা সাবা : ৪৬)।

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য যে, যুলুমকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে, ঘৃণা ও অপছন্দ করবে এবং প্রতিরোধ করবে। আর এটা করতে কোন স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও আগ্রাসী শাসকের মুখোমুখি হতে ভয় পাবে না। এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। "রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন, "যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা" (ইবনে মাজা, ফিতান, বাবুল আমর বিল মা'রূফ)।

(ঘ) যে জিনিসের প্রচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাছাড়া সকল সত্য ও সঠিক তথ্য অবাধে প্রকাশ করা যাবে, এতে নিষেধাজ্ঞা নেই।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ.

"যখন তাদের কাছে শান্তি বা ভীতির কোন খবর আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। তারা যদি এসব খবর রসূলের নিকট বা তাদের দায়িত্বশীলদের নিকট পাঠিয়ে দিতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা সত্য আহরণ করে থাকে, তারা তা জানতো" (সূরা আন-নিসা : ৮৩)।

www.pathagar.com

(ঙ) ধর্মীয় ব্যাপারে যারা মুসলমানদের বিরোধী, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে সম্মান করাও ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কাজেই অমুসলিমদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং সামাজিকভাবে তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ.

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে তোমরা তাদের উপাস্যকে গালাগালি করো না। তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালাগালি করবে। আমি এভাবেই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের কর্মকাণ্ডকে আকর্ষণীয় করে রেখেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের ফিরে যেতেই হবে" (সূরা আল-আনআম : ১০৮)।

১৩– ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা রয়েছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম" (সূরা কাফিরূন : ৬)।

১৪– দাওয়াত ও প্রচারের স্বাধীনতা

(ক) জাতি বা সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একাকী বা অন্যকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে। এ অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা যে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করার অধিকারও তার রয়েছে।

قُلْ هذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ.

"বলো, এটা আমার পদ্ধতি। আমি আল্লাহর পথে আহ্বান করি। আমি ও আমার অনুসারীরা প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি" (সূরা ইউসুফ : ১০৮)।

(খ) সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং সততা ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গকে এই দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট দাবি জানানো প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

কেননা একমাত্র ইসলামী শরীআতই দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে– মহান সৃষ্টিকর্তা তার বান্দাদের প্রতি যে অসীম দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেন তারই ভিত্তিতে। আর ইসলামী শরীআতই পার্থিব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে ও উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়। যেমন বিশেষজ্ঞ চিন্তাবিদগণ বলেন, ইসলামী শরীআত বিশ্বপ্রকৃতির সকল জড়বস্তু ও মানবীয় বিবেকবুদ্ধির সাথে একই সাথে সমন্বয় বিধান করে। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যবর্তী একটি ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা। কাজেই এর একটি অপরটির ওপর হস্তক্ষেপ করে না ও আগ্রাসন চালায় না। এর ফলে মানব জীবন পৃথিবীতে সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আল্লাহ তাআলাকে কখনো ক্রোধান্বিত করে না এবং তা তার সুসমন্বিত কাঠামোর ওপর চিরদিন টিকে থাকে।

মানবাধিকার সংরক্ষণে ও তার তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইনের ভূমিকা নিশ্চিত করা ও এই ভূমিকা নতুন করে প্রত্যয়ন করার লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত বিশ্ব ইসলামী পরিষদ, "আল- মুতামার আল-আলামিল ইসলামী" গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ তারিখে "ইসলামের মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা" প্রচার করে। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে মানবাধিকারের ধারাসমূহের যে ভিত্তি ও উৎস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই এ ঘোষণার আওতাভুক্ত।

ঘোষণার ভূমিকা

মানবাধিকারের ইসলামী উৎসের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এই ঘোষণা উপস্থাপন করছি। আর এই উৎসকে আনুষ্ঠানিক, মৌলিক ও প্রত্যক্ষ বলে গণ্য করা যায়। কেননা এটা আমাদের কাছে কুরআন ও হাদীসের মধ্য দিয়ে স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

বিশ্ব ইসলামী পরিষদ ইসলামী শরীআতের অলংঘনীয় উৎস কুরআন ও হাদীসের অনুসরণে ও মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের ধারা-উপধারাসমূহ পর্যালোচনা করে মানবাধিকারের এই ঘোষণা প্রণয়ন করেছে।

ইসলামের মানবাধিকার সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক ঘোষণা মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁরা তাঁদের এই মহান সাধনায় ব্রতী হন হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর শুভ সূচনা উপলক্ষে। এ ঘোষণা প্রচারিত হয় উল্লিখিত তারিখে প্যারিস থেকে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে :

৪—

www.pathagar.com

"দেশ ও জাতি নির্বিশেষে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম জনতা, আমাদের পবিত্র মহাগ্রন্থের আলোকে মহাবিশ্বে মানুষের অবস্থান ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্রান্ত নির্ভুল ও সঠিক দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে, আল্লাহর দিকে আহ্বানের পতাকাবাহী আমরা মুসলমানরা, দীন ইসলামের নামে পঞ্চদশ হিজরীর সূচনালগ্নে পবিত্র কুরআন ও মহান সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত এই ঘোষণা প্রচার করছি।"

এই অধিকারগুলো তার বর্তমান অবয়বে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এর কোন অংশ কখনো রহিত, পরিবর্তিত ও স্থগিত বা বর্জনযোগ্য নয়। এগুলো এমন অকাট্য অধিকার, যাকে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। তাই কোন মানুষের, চাই সে যে-ই হোক না কেন, এগুলিকে স্থগিত করা বা এর ওপর কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় বা সমাজের ইচ্ছায়, তার প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানে, চাই তার প্রকৃতি যেমনই হোক এবং তার কর্তৃক ক্ষমতা যতই প্রবল হোক, এ অধিকারগুলোর স্বতন্ত্র সংরক্ষিত অস্তিত্ব কিছুতেই ক্ষুণ্ন হবে না। এ অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সঠিক উপায় ও পথ।

১– ধারা : এ সমাজে সকল মানুষ সমান। জাতীয়তা, বংশ, গোত্র, লিংগ, বর্ণ, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য নেই।

২– ধারা : এ সমাজে সমতাই অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যভার প্রাপ্তির ভিত্তি। আর মানুষের জন্মের উৎস এক হওয়াই এ সমতার ভিত্তি ও কারণ।

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى.

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি" (আল-হুজুরাত : ১৩)।

আর মহান আল্লাহ মানুষকে পরম সম্মানে ভূষিত করেছেন এই বলে :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً.

"আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি" (আল-ইসরা : ৭০)।

৩– ধারা : এ সমাজে মানুষের স্বাধীনতা তার জীবনের সার্থকতারই সমার্থক। সে

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করুক, স্বাধীন পরিবেশে নিজের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটাক, দমন, পরাধীনতা, অবমাননা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত অবস্থায় বেড়ে উঠুক, এটা এই সমাজ নিশ্চিত করবে।

৪– ধারা : পরিবার এই সমাজের ভিত্তি। সমাজ তাকে সর্বাত্মক সম্মান ও নিরাপত্তা দেবে এবং তার স্থিতি ও উন্নয়নের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করবে।

৫– ধারা : এই সমাজে আল্লাহর রচিত আইনের সামনে শাসক ও শাসিত সমান। তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ও বৈষম্য থাকবে না।

৬– ধারা : এ সমাজে শাসন ক্ষমতা একটি আমানত, যা শাসকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে শরীআতের ইপ্সিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শরীআতের নির্ধারিত পদ্ধতিতেই বাস্তবায়িত হয়।

৭– ধারা : এই সমাজের সকলে বিশ্বাস করে, একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগতের একচ্ছত্র মালিক, মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর সকল সৃষ্টির ব্যবহারের উপযোগী। সেগুলো তার সেবায় ও উপকারার্থে নিয়োজিত। এগুলো তাঁর কৃপার দান, এতে কারো কোন অগ্রাধিকার নির্ধারিত নেই এবং প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে আল্লাহর এই দান থেকে তার ন্যায্য অংশ লাভ করার।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوتِ وَمَا الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী করেছেন" (আল-জাছিয়া : ১৩)।

৮– ধারা : এই সমাজে সমগ্র উম্মাহর যাবতীয় বিষয় পরিচালনা ও সংহত করার নীতিমালা নির্ধারিত রয়েছে এবং যে ক্ষমতাবলে সেই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হবে, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে পরামর্শের ভিত্তিতে।

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

"তাদের সামষ্টিক কার্যকলাপ পরামর্শের ভিত্তিতে চলে" (আশ্-শূরা : ৩৮)।

৯– ধারা : এ সমাজে যাবতীয় পরিপূরক সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ও সুলভ থাকবে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব বহন ও পালন করতে পারে। অতঃপর ইহকালে জনগণের সামনে ও পরকালে তার স্রষ্টার সামনে জবাবদিহি করবে।

www.pathagar.com

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে"।[১]

১০- ধারা : এ সমাজ আদালতের সামনে শাসক ও শাসিত একই কাতারে সমান মর্যাদায় দাঁড়াবে, এমনকি বিচারানুষ্ঠান পর্যায়ের যাবতীয় কার্যকলাপেও।

১১- ধারা : এ সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের বিবেকস্বরূপ। তার অধিকার রয়েছে, যে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে সমাজের পক্ষ থেকে মামলা রুজু করার। অন্যদের কাছ থেকেও তার সাহায্য ও সমর্থন চাওয়ার অধিকার রয়েছে। অন্যদেরও কর্তব্য তাকে সাহায্য করা এবং তার ন্যায়সংগত দাবিতে তার বিরোধিতা না করা।

১২- ধারা : এ সমাজ সকল ধরনের আগ্রাসন প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শান্তি, স্বাধীনতা, সম্মান ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহর আইন মানুষকে যে সকল অধিকার দিয়েছে, তার অনুগত থেকে, তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়ে ও তা সংরক্ষণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে উক্ত অধিকারসমূহ নিশ্চিত করবে। ইসলাম সারা বিশ্বের জন্যই এ অধিকারগুলো ঘোষণা করছে।

ঘোষণার ভাষ্য

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইসলামের মানবাধিকার (১)

১- জীবনের অধিকার

(ক) মানুষের জীবন পবিত্র। তার ওপর আক্রমণ ও আগ্রাসন চালানো কারো জন্য বৈধ নয়।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

"যে ব্যক্তি কোন হত্যাকাণ্ড বা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টির (অপরাধ) ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি তাকে রক্ষা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করলো" (আল-মাইদা : ৩২)।

www.pathagar.com

শরীআত প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত এবং শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থা ব্যতীত এই অধিকারের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

(খ) মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক সত্তা একটি সুরক্ষিত জিনিস। তার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে শরীআত একে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করে। মানুষের দেহ উভয় অবস্থায় সম্মানজনক ও বিনম্র ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে কাফন পরায়, তখন সে যেন উত্তমরূপে কাফন পরায়" (আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, নং ৩১৪৮)। তার শরীরের গোপনীয় অংশ ও ব্যক্তিগত দোষত্রুটি লুকিয়ে রাখা ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা যা করেছে তার কাছেই চলে গেছে" (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৪০, বুখারী হাদীস নং ১৩৯৩)। অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করার স্থানেই পৌঁছে গেছে।

২– স্বাধীনতার অধিকার

(ক) মানুষের স্বাধীনতা তার জীবনের মতই পবিত্র। এটা তার জন্মগ্রহণকালীন প্রথম স্বাভাবিক অবস্থা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : "প্রত্যেক শিশুই স্বাভাবিক (স্বাধীন) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে" (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২২৯)। এ স্বাধীনতা আজীবন তার সাথে থাকবে ও অব্যাহত থাকবে। এর ওপর কোন আঘাত, আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছিলেন, "তোমরা কখন মানুষকে পরাধীন করলে? অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায় প্রসব করেছিল।"[২]

ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকমের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরী। একমাত্র শরীআতের অনুমতি বা নির্দেশ ব্যতীত এবং তার অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত এই স্বাধীনতা খর্ব করা বৈধ নয়।

(খ) কোন জাতির জন্য অপর জাতির স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ বা আগ্রাসন চালানো বৈধ নয়। যে জাতির ওপর আগ্রাসন চালানো হয় সকল সম্ভাব্য উপায়ে আগ্রাসন প্রতিহত করা ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার অধিকার তার রয়েছে।

টীকা : শুধু 'অধিকার' শব্দটি উল্লেখ করলাম, 'দায়িত্ব' শব্দটি উল্লেখ করলাম না। কেননা যে জিনিস কারো জন্য অধিকার, সে জিনিস অন্যের জন্য দায়িত্ব। যেমন প্রজার অধিকার শাসকের দায়িত্ব, স্ত্রীর অধিকার স্বামীর কর্তব্য ইত্যাদি। যেহেতু ইসলামে মানবাধিকার স্থান ও সম্পর্কের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের জন্যই তাই যা একজনের জন্য অধিকার অন্যজনের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য (গ্রন্থকার)।

www.pathagar.com

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ.

"যে ব্যক্তি অত্যাচারের শিকার হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই" (আশ-শূরা : ৪১)।

যে জাতি নিজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, তার সাহায্য করা সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজের কর্তব্য। এ ব্যাপারে মুসলমানদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যা পালনে কোন শৈথিল্যের অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন :

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنهُمْ فِى الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَاتَوُا الزَّكوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তাদেরকে আমি পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাস করার ক্ষমতা দিলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে" (আল-হাজ্জ : ৪১)।

৩– সমতার অধিকার

(ক) শরীআত তথা ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "একজন অনারবের ওপর একজন আরবের, একজন আরবের ওপর অনারবের, কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের সততা ও আল্লাহভীতি ব্যতীত আর কোন ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ সা.-এর ভাষণ থেকে, মুসনাদ আহমাদ, ৫/৪১১; আবু দাউদ ৪/১৩২)।

এ অধিকার বাস্তবায়নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্যের কোন অবকাশ নেই। রসূলুল্লাহ সা. বলেন, "মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম" (আবু দাউদ, হুদূদ, হা-৪৩৭৩)।

অধিকার সংরক্ষণেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদাভেদের অবকাশ নেই। আবু বকর রা. খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, জেনে রাখো! যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, আমি যতক্ষণ তার অধিকার আদায় করে দিতে না পারবো, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, তার কাছ থেকে আমি যতক্ষণ অধিকার আদায় করতে না পারবো, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল।"

(খ) মানবীয় মূল্যায়ন ও সম্মানে মানুষ সমান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূলুল্লাহ

www.pathagar.com

সা. বলেছেন, "তোমাদের সবাই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী" (আবু দাউদ, আদাব, বাব তাফাখুর, ৪/৩৩১)। মর্যাদার তারতম্য হবে কেবল কাজ দ্বারা। সূরা আহকাফের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

"সকল মানুষের জন্য নিজ নিজ কাজ অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে।" কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির চেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্মুখীন করা যাবে না। হাদীস : "মুসলমানদের রক্তের বদলা সমান হারে নেয়া হবে" (ইবনে মাজা, ২/৮৫৯; আবু দাউদ, ৩/৮০ নং ২৭৫১)। যদি কোন ধ্যানধারণা, মতাদর্শ, আইন বা পরিস্থিতি জাতীয়তা, বর্ণ, বংশ, ভাষা বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের অবকাশ সৃষ্টি করে, তবে তা ইসলামের এই সর্বব্যাপী মূলনীতির বিপরীত হবে।

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে সমাজের বস্তুগত সম্পদসমূহ থেকে সমান কর্মের সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে উপকৃত হওয়ার। কর্মের এই সুযোগের ব্যবহারে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী সুবিধা পাবে না।

فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ.

"অতএব তোমরা পৃথিবীর দিকে দিকে চলাফেরা করো এবং তাঁর দেয়া জীবিকা থেকে আহার করো" (সূরা মুলক, ১৫)।

যতক্ষণ প্রদত্ত শ্রম পরিমাণে ও মাপে সমান থাকবে এবং কৃত কাজ পরিমাণে ও মাপে এক থাকবে, ততক্ষণ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারিশ্রমিকে ভেদাভেদ ও তারতম্য করা বৈধ হবে না।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

"যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভালো কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে কণা পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখবে" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)।

৪- ইসলামী আইনে বিচার লাভের অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে অন্য আইন ব্যবস্থা ব্যতীত ইসলামী শরীআতের অধীন বিচার প্রার্থনা করার। আল্লাহ বলেছেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

www.pathagar.com

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও, তাহলে সেটিকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে নিয়ে যাও" (সূরা নিসা : ৫৯)।

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ.

"তুমি তাদের মধ্যে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন, তার ভিত্তিতে ফায়সালা করে দাও, তাদের খেয়াল-খুশীমত চলো না" (সূরা মাইদা : ৪৯)।

(খ) কোন ব্যক্তির ওপর কোন প্রকার যুলুম হলে তা প্রতিহত করার অধিকার তার রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ.

"আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না। তবে যার ওপর যুলুম হয়েছে তার কথা ভিন্ন" (সূরা নিসা : ১৪৮)।

এটাও তার দায়িত্ব যে, অন্য কারো ওপর যুলুম হলে সাধ্যমত তা প্রতিহত করবে। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের উচিত যালেম কিংবা মাযলুম উভয় অবস্থায় তার ভাইকে সাহায্য করা। যালেম হলে তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা, মযলুম হলে তাকে সাহায্য করা উচিত" (মুসনাদ আহমাদ, ৩/৩২২৪)।

ব্যক্তির অধিকার রয়েছে কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, যা তার প্রতি ইনসাফ করবে, তাকে রক্ষা করবে এবং তার ওপর কৃত যুলুম ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিহত করবে। মুসলিম শাসকের কর্তব্য এরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা ও সেই কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। হাদীসে রয়েছে : "শাসক হচ্ছে ঢালস্বরূপ, তার ছত্রছায়ায় থেকে যুদ্ধ করা হয় ও আত্মরক্ষা করা হয়" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাবুল ইমাম জুন্নাতুন)।

(গ) ব্যক্তির এটা অধিকার এবং কর্তব্য, অন্য যে কোন ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা ও দলের অধিকার রক্ষা করা এবং এ কাজে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশা করা। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী কে জানাবো না? যে ব্যক্তি তলবের আগেই সাক্ষ্য দেয়" (আবু দাউদ : ৩/৩০৬, কিতাবুল আকদিয়া)। অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে আহ্বান করা ছাড়াই শুধু আল্লাহর পুরস্কারের আশায় স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দেয়া।

(ঘ) কোন অজুহাতেই ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হরণ করা বৈধ নয়। "নিশ্চয়ই অধিকারের দাবিদারের কিছু বক্তব্য রয়েছে" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতিকরাদ, বাব ইসতিকরাদিল ইবিল)। "যখন তোমার সামনে দুই পক্ষ

www.pathagar.com

(বাদী-বিবাদী) আসন গ্রহণ করে, তখন প্রথম জনের বক্তব্য যেমন শুনেছ তেমন দ্বিতীয় জনের কথা না শোনা পর্যন্ত কোনক্রমেই ফায়সালা করো না। কেননা এটাই তোমার কাছে বিচার্য বিষয় সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য অধিকতর উপযোগী পন্থা" (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৮২)।

(ঙ) শরীআত বিরোধী কোন আদেশ মেনে নিতে কোন মুসলমানকে বাধ্য করার অধিকার কারো নেই। কোন মুসলমানকে যে ব্যক্তি কোন গুনাহর কাজের আদেশ দেয় সেই আদেশদাতা যেই হোক, তার মুখের ওপরই 'না' বলা মুসলমানের কর্তব্য। মহানবী (সা) বলেন, "যখন তাকে গুনাহর কাজের আদেশ দেয়া হয়, তখন তার জন্য তা শোনাও বৈধ নয়, তার আনুগত্য করাও বৈধ নয়" (ইবনে মাজা, জিহাদ, হাদীস নং ২৮৬৪)।

মুসলিম সমাজ ও দলের কাছে তার অধিকার রয়েছে, সত্যের প্রতি একাত্মতার স্বার্থে তারা অন্যায় আদেশ প্রত্যাখ্যানে তাকে সাহায্য করবে। মহানবী (সা) বলেন, "মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর যুলুমও করবে না, তাকে অসহায়ও ছেড়ে দিবে না" (আবু দাউদ, আদাব, বাবুল মুওয়াখাত, ৪/২৭৩)।

৫– ন্যায়সংগতভাবে বিচার লাভের অধিকার

(ক) অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ মূলত নিরপরাধ। "প্রকাশ্যে অপরাধকারীরা ব্যতীত আমার উম্মতের সবাই নির্দোষ" (বুখারী, আদাব, বাব সিতরিল মুমিন আলা নাফসিহি)। এমনকি একটি ন্যায়বিচারক আদালতের সামনে চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হলেও সে সর্বদাই নির্দোষ ও নিরপরাধ বিবেচিত হবে।

(খ) সুস্পষ্ট আইনী ভাষ্য ছাড়া কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

"একজন রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাব দিতাম না" (সূরা ইসরা : ১৫)।

অনিবার্যভাবেই ইসলাম সম্পর্কে জানা থাকে এমন বিষয়ে কোন মুসলমানের অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা যাবে না। তবে যখন অজ্ঞতা প্রমাণিত হবে তখন তা বিবেচনায় নিতে হবে। সন্দেহ দ্বারা হদ্দ বাতিল হয়।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ.

"তোমরা যা ভুল করেছ তার জন্য তোমাদের ওপর কোন অভিযোগ নেই, তবে স্বেচ্ছায় যা কিছু করেছ তা স্বতন্ত্র" (সূরা আহযাব : ৫)।

www.pathagar.com

(গ) কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না, কোন অপরাধের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না একটা পূর্ণাংগ আদালতের সামনে অপ্রত্যাহারযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার অপরাধী হওয়া প্রমাণিত হয়।

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا.

"কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তদন্ত করে নিশ্চিত হও" (সূরা হুজুরাত : ৬)।

وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

"ধারণা-অনুমান সত্যের অভাব পূরণ করে না" (সূরা আন্-নাজম : ২৮)।

(ঘ) শরীআত অপরাধের যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে, তাতে কোন অবস্থাতেই ছাড় দেয়া যাবে না।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا.

"এ হচ্ছে আল্লাহর সীমা, কাজেই তোমরা এটা লংঘন করো না" (সূরা আল-বাকারা : ২২৯)।

যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তা বিবেচনা করে শাস্তি মওকুফ করা শরীআতের অন্যতম মূলনীতি। "যতদূর সম্ভব, মুসলমানদের শাস্তি প্রতিহত কর। যদি তাকে রেহাই দেয়ার কোন সুযোগ থাকে তবে রেহাই দাও" (ইবনে মাজা, ২/৮৫০, তিরমিযী ২/৪৩৯)।

(ঙ) কোন মানুষকে অন্য মানুষের অপরাধে পাকড়াও করা যাবে না।

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى.

"কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পাপের বোঝা বহন করবে না" (সূরা আল-ইসরা : ১৫)।

আর প্রত্যেক মানুষ আলাদাভাবে নিজের কাজের জন্য দায়ী।

وكُلُّ أَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ.

"প্রত্যেক মানুষ নিজের উপার্জিত গুনাহর হাতে যিম্মী" (সূরা তূর : ২১)।

কোন অবস্থাতেই অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারীদের পর্যন্ত গড়াতে দেয়া বৈধ নয়।

قَالَ مَعَاذَ اللّهِ اَنْ نَّأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا الظّٰلِمُوْنَ.

www.pathagar.com

"সে বললো, আল্লাহর আশ্রয় চাই, যার কাছে আমাদের জিনিস পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমরা ধরতে পারি না। তাহলে তো আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো" (সূরা ইউসুফ : ৭৯)।

৬– শাসকের অত্যাচার থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। তার কোন কাজ বা অবস্থার ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার কারো নেই। অনুরূপ এমন শক্তিশালী কারণ ছাড়া কাউকে কোনরূপ দোষারোপ করা যাবে না যে কারণ তার প্রতি আরোপিত অভিযোগের সাথে তার জড়িত থাকার প্রমাণ দেয়।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

"আর যারা মুমিন নারী ও পুরুষদের ওপর তারা যা করেনি, তার অভিযোগ আরোপ করে, তারা সুস্পষ্ট অপবাদ ও গুনাহে লিপ্ত হয়" (সূরা আল-আহযাব : ৫৮)।

৭– দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার

(ক) অভিযুক্ত তো দূরের কথা, অপরাধীকেও দৈহিকভাবে নির্যাতন করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যারা দুনিয়ায় মানুষকে নির্যাতন করে, তাদেরকে আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।" অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যে অপরাধ করেনি, সেই অপরাধের স্বীকারোক্তি করাতে বাধ্য করাও বৈধ নয়। আর বল প্রয়োগমূলক পন্থায় যা কিছু কেড়ে নেয়া হয়, তা বাতিল। "রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমার উম্মতকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ভুল-ত্রুটি থেকে এবং যা করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা থেকে" (ইবনে মাজা, ১/৬৫৯)।

(খ) কোন ব্যক্তির অপরাধ যত গুরুতরই হোক এবং আইন অনুযায়ী তার যে শাস্তিই নির্ধারিত হোক, তার মানবোচিত সম্মান ও মানবাধিকার সর্বাবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে।

৮– সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার

ব্যক্তির সম্মান ও সুনাম একটা পবিত্র জিনিস, যা অলংঘনীয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের মধ্যে ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের আজকের এই দিন এই মাসে এই শহরে পবিত্র" (ইবনে মাজা, মানাসিক, নং ৩০৫৫)। তার গোপন তথ্য খোঁজা এবং তার ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا.

"তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না এবং একজন অপরজনের গীবত করো না" (সূরা হুজুরাত : ১২)।

وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَبِ.

"তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করো না ও একে অপরকে খারাপ উপাধিতে ভূষিত করো না" (সূরা হুজুরাত : ১১)।

৯- নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের অধিকার

(ক) প্রত্যেক মজলুম ও নির্যাতিত মুসলমানের অধিকার রয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেখানে সে নিরাপদ মনে করবে, আশ্রয় প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক নির্যাতিতের জন্য ইসলাম এ অধিকার নিশ্চিত করে, চাই তার জাতীয়তা, বিশ্বাস ও বর্ণ যাই হোক। ইসলাম মুসলমানদের ওপর নির্যাতিতের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করে যে, যখনই সে তাদের কাছে আশ্রয় চাইবে, তাকে আশ্রয় দেয়া হবে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ.

"কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায় তবে তাকে আল্লাহর বাণী শ্রবণ পর্যন্ত আশ্রয় দাও, তারপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও" (সূরা আত্-তাওবা : ৬)।

(খ) মক্কা শরীফে মসজিদুল হারাম সকল মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কোন মুসলমানকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়া যাবে না।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أٰمِنًا.

"যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ" (সূরা আল ইমরান : ৯৭)।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا.

"স্মরণ করো, যখন আমি পবিত্র ঘরকে মানুষের নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল বানিয়েছি" (সূরা আল-বাকারা : ১২৫)।

سَوَاءً الْعٰكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ.

"এখানে স্থায়ী বাসিন্দা ও অস্থায়ী বাসিন্দা সবাই সমান" (সূরা হজ্জ : ২৫)।

www.pathagar.com

১০– সংখ্যালঘুর অধিকার

(ক) সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার কুরআনের নিম্নোক্ত সর্বব্যাপী ঘোষণা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে :

لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ.

"ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৬)।

(খ) সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার ও তাদের পারিবারিক অধিকার : তারা যখন ইসলামী সরকারের নিকট বিচারপ্রার্থী হবে, তখন তাদের এসব অধিকারের বিচার-ফায়সালা ইসলামী আইন অনুসারেই করা হবে।

فَإِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ.

"তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে দিন অন্যথায় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকেন, তবে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, তবে তা ন্যায়সংগতভাবে করে দিন" (সূরা আল-মাইদা : ৪২)।

ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন না হলে তাদের নিজেদের ধর্মীয় বিধির শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ م بَعْدِ ذٰلِكَ.

"তারা কিভাবে তোমার নিকট বিচারপ্রার্থী হবে, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান। তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়" (সূরা আল-মাইদা : ৪৩)

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ.

"ইনজীলের অনুসারীদের ইনজীল অনুসারে বিচার ফায়সালা করা উচিত" (সূরা আল-মাইদা : ৪৯)।

১১– জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার

(ক) একটি জাতির জীবনে জনগণের সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট যত

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, তা জানার অধিকার জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। সেসব কর্মকাণ্ডে তার শক্তি-সামর্থ্য ও মেধা-যোগ্যতা অনুসারে অংশগ্রহণ করা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা পরামর্শের বিধান বাস্তবায়নের জন্যই তা প্রয়োজন।

وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

"তাদের সামগ্রিক তৎপরতা পরমর্শের ভিত্তিতে চলবে" (সূরা আশ্-শূরা : ৮৭)।

জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির আইনানুগ শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সরকারী পদ ও চাকরী লাভের অধিকার রয়েছে। কোন ধরনের বংশগত, জাতিসত্তাগত বা গোষ্ঠীগত বিবেচনায় এ অধিকার বিলুপ্ত বা ক্ষুণ্ন হবে না। "মুসলমানদের রক্তের মর্যাদা সমান। তারা তাদের পরস্পরের ওপর কর্তৃত্বশীল। তাদের নগণ্যতম ব্যক্তিও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার অধিকার রাখে" (ইবনে মাজা, কিতাবুদ দিয়াত, ২/৮৯৫)।

(খ) পরামর্শ হচ্ছে শাসক ও জাতির মাঝে সম্পর্কের সেতুবন্ধন। এই মূলনীতির বাস্তবায়নের দাবিতে জাতির অধিকার রয়েছে স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের শাসক নির্বাচনের। শাসকগণ যখন শরীআত থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের সমালোচনা করা ও বরখাস্ত করার অধিকারও জনগণের রয়েছে। খেলাফত লাভের পর প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর রা. বলেন, "আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হয়েছি, অথচ আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি নই। তোমরা যদি দেখো, আমি ন্যায়ের ওপর আছি তাহলে আমাকে সাহায্য করো। আর যদি দেখো, আমি বাতিলের ওপর আছি তাহলে আমাকে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করে দিও। যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হই, তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য থাকবে না।"

১২- স্বাধীনভাবে চিন্তা বিশ্বাস ও মত প্রকাশের অধিকার

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি, শরীআতের সীমালংঘন না করার শর্তে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, বিশ্বাস করা এবং নিজের চিন্তা ও বিশ্বাসকে প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকারী। তার এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে বা অধিকারকে বিলুপ্ত করতে পারে না। তবে কোন বাতিল বা অন্যায় জিনিস প্রচার করা যাবে না। কোন অশ্লীল বিষয় বা জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী বিষয় প্রচার করা যাবে না।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

www.pathagar.com

وَالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ إِلاَّ قَلِيْلاً. مَّلْعُوْنِيْنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوْا أُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً.

"মুনাফিকরা, অন্তরে যাদের রোগ আছে তারা এবং যারা মদীনায় গুজব রটনা করে বেড়ায়, তারা যদি এসব থেকে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের ওপর পরাক্রমশালী করবো। তারপর তারা এ শহরে আপনার প্রতিবেশীরূপে অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে। আর তাও করতে পারবে অভিশপ্ত অবস্থায়, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরপাকড় করা হবে এবং ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে" (সূরা আহযাব : ৬০-৬১)।

(খ) সত্যের সন্ধানে স্বাধীন চিন্তা-গবেষণা শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যও বটে।

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا.

"বলো, আমি তোমাদের একটি মাত্র উপদেশ দেই যে, তোমরা আল্লাহর জন্য দুই দুইজন করে ও একজন একজন করে দাঁড়াও, তারপর চিন্তা করো" (সূরা সাবা : ৪৬)।

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য যে, যুলুমকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে, ঘৃণা ও অপছন্দ করবে এবং প্রতিরোধ করবে। আর এটা করতে কোন স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও আগ্রাসী শাসকের মুখোমুখি হতে ভয় পাবে না। এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ। "রসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন, "যালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা" (ইবনে মাজা, ফিতান, বাবুল আমর বিল মা'রূফ)।

(ঘ) যে জিনিসের প্রচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাছাড়া সকল সত্য ও সঠিক তথ্য অবাধে প্রকাশ করা যাবে, এতে নিষেধাজ্ঞা নেই।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ.

"যখন তাদের কাছে শান্তি বা ভীতির কোন খবর আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। তারা যদি এসব খবর রসূলের নিকট বা তাদের দায়িত্বশীলদের নিকট পাঠিয়ে দিতো, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা সত্য আহরণ করে থাকে, তারা তা জানতো" (সূরা আন-নিসা : ৮৩)।

www.pathagar.com

(ঙ) ধর্মীয় ব্যাপারে যারা মুসলমানদের বিরোধী, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে সম্মান করাও ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কাজেই অমুসলিমদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং সামাজিকভাবে তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ.

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে তোমরা তাদের উপাস্যকে গালাগালি করো না। তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালাগালি করবে। আমি এভাবেই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের কর্মকাণ্ডকে আকর্ষণীয় করে রেখেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের ফিরে যেতেই হবে" (সূরা আল-আনআম : ১০৮)।

১৩– ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা রয়েছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ.

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম" (সূরা কাফিরূন : ৬)।

১৪– দাওয়াত ও প্রচারের স্বাধীনতা

(ক) জাতি বা সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একাকী বা অন্যকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে। এ অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বা যে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করার অধিকারও তার রয়েছে।

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ.

"বলো, এটা আমার পদ্ধতি। আমি আল্লাহর পথে আহ্বান করি। আমি ও আমার অনুসারীরা প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি" (সূরা ইউসুফ : ১০৮)।

(খ) সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং সততা ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গকে এই দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট দাবি জানানো প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল গঠিত হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে" (সূরা আল ইমরান : ১০৪)।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى.

"তোমরা সততা ও তাকওয়ার জন্য সহযোগিতা করো" (সূরা আল-মাইদা : ২)। মহানবী (সা) বলেন, "লোকেরা যখন কোন দুরাচারীকে দেখবে এবং তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিহত করবে না, তখন আল্লাহর আযাব তাদের সকলের ওপর পতিত হতে বেশী বিলম্ব হবে না" (আবু দাউদ, মালাহিম, বাবুল আমর ওয়ান-নাহী, ৪/১২২)।

১৫– অর্থনৈতিক অধিকার

(ক) যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর মালিকানাধীন সম্পদ।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব ও তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর" (সূরা আল-মাইদা : ১২০)।

এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে প্রদত্ত উপহার। তিনি তাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার দিয়েছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوتِ وَمَا فِى الأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ.

"তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী করেছেন" (সূরা আল-জাছিয়া : ১৩)।

প্রকৃতির যে কোন সম্পদকে ধ্বংস বা নষ্ট করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

وَلاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"পৃথিবীতে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না" (সূরা আশ্-শুআরা : ১৮৩)।

প্রকৃতিতে জীবিকার যত উৎস রয়েছে, তা দ্বারা উপকৃত হবার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা বা কারো অধিকার প্রয়োগে বাধা দেয়া কারো জন্য বৈধ নয়।

৫—

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا.

"তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত" (সূরা আল-ইসরা : ২০)।

(খ) আইনসংগত উপায়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করা ও উৎপাদন করার অধিকার সকলেরই রয়েছে।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا.

"পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর" (সূরা হূদ : ৬)।

فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ.

"তোমরা পৃথিবীর দিকে দিকে ভ্রমণ করো এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকা আহার করো" (সূরা মুলক : ১৫)।

(গ) ব্যক্তি মালিকানা বৈধ, চাই একক বা যৌথ যে রকমই হোক। নিজের চেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে বিনিয়োগ করা বা সঞ্চয় করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে।

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى.

"তিনিই মানুষকে অভাবশূন্য করেছেন ও সম্পদশালী করেছেন" (সূরা আন-নাজম : ৪৮)। সামষ্টিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাও বৈধ এবং তা সম্পূর্ণরূপে জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে হবে।

مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

"জনপদবাসীদের কাছ থেকে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের, যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী শুধু তাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়" (সূরা আল-হাশর : ৭)।

(ঘ) জাতির দরিদ্রদের জন্য ধনীদের সম্পদে নির্দিষ্ট প্রাপ্য রয়েছে, যা যাকাতের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ فِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"যাদের সম্পদে সুবিদিত প্রাপ্য রয়েছে প্রার্থীর জন্য ও বঞ্চিতের জন্য" (সূরা আল-মা'আরিজ : ২৪ ও ২৫)।

এ অধিকার স্থগিত করাও যায় না, নিষিদ্ধ করাও যায় না, শাসকের পক্ষ থেকে এ থেকে অব্যাহতি দেয়াও যায় না। এমনকি এটা বন্ধ করে দেয়ার ফলে যদি যাকাত দিতে অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও অবধারিত হয়ে পড়ে, তাহলেও তা আদায় করা থেকে পিছ পা হওয়া যাবে না। যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শের পর আবু বকর রা. বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তারা যদি রসূলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় যাকাতের ছাগলের যে রশি, যাকাতের সাথে দিত, তাও দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম" (আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, ২/২৯)।

(ঙ) সম্পদের উৎসসমূহ ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণসমূহকে জাতির স্বার্থে কাজে লাগানো জরুরী। সুতরাং এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ও অবহেলা করা বৈধ নয়। মহানবী (সা) বলেন, "যে বান্দাকে আল্লাহ কোন একদল মানুষের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং সে তাদের কল্যাণ কামনা করে না, সে বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না" (বুখারী, আহ্কাম, বাব মান ইসতারাআ রাঈয়্যাতান; ফাতহুল বারী, ১৩/১২৬-১২৭০ অনুরূপ)। শরীআতে নিষিদ্ধ বা জনগণের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজে তা বিনিয়োগ করাও বৈধ নয়।

(চ) অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে চালু রাখা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলাম নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হারাম ঘোষণা করেছে :

১- সকল ধরনের ভেজাল ও মিশ্রণ : "যে ভেজাল করে সে আমাদের কেউ নয়" (ইবনে মাজা, হাদীস নং ২২২৪, ২/৭৪৯)।

২- প্রতারণা, অজ্ঞাত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে এমন যে কোন ধরনের লেনদেন, যাকে কোন নির্দিষ্ট ও বাস্তব মানদণ্ডের অধীনে আনা যায় না। "রসূলুল্লাহ সা. নুড়ি পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রি ও প্রতারণার বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন" (ইবনে মাজা, তিজারাত, ২/৭৩৯ হাদীস নং ২১৯৪)। "রসূলুল্লাহ সা. আঙ্গুর কালো না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা ও দানা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন" (অর্থাৎ খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি নিষিদ্ধ) (ইবনে মাজা, তিজারাত, নং ২২১৭)।

www.pathagar.com

৩- বিনিময়ভিত্তিক লেনদেনে পরস্পরকে ঠকানো ও ধোঁকা দেয়া :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

"সর্বনাশ তাদের জন্য, যারা ঠগবাজী করে, যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি মেপে নেয়, আর মেপে দেয়ার সময় কম দেয়" (সূরা মুতাফফিফীন : ১, ২, ৩)।

৪- পণ্য গোলাজাত করা এবং অসম প্রতিযোগিতামূলক যে কোন লেনদেন : "গুনাহগার ব্যতীত কেউ গোলাজাত করে না" (ইবনে মাজা, তিজারাত, ২/৭২৮)।

৫- সুদ এবং যে কোন ধরনের একতরফাভাবে চাপিয়ে দেয়া উপার্জন, যা মানুষের অনন্যোপায় অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে করা হয়।

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا.

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৫)।

৬- মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রচারণার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় : "ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ত্যাগ না করে, ততক্ষণ তাদের তা গ্রহণ-বর্জনের স্বাধীনতা থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য বলে ও স্বচ্ছতার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের ব্যবসায়ে বরকত হবে। আর যদি ভেজাল বা প্রতারণা করে ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের ব্যবসায়ের বরকত নষ্ট হবে" (আবু দাউদ, বুয়ূ, ৩/২৭৩)।

৮- জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও সাধারণ ইসলামী মূল্যবোধগুলোর আনুগত্য এই দুটোই হলো ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একক পূর্বশর্ত।

১৬– মালিকানা সংরক্ষণের অধিকার

জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন ব্যতীত বৈধভাবে উপার্জিত কোন সম্পদের মালিকানা কেড়ে নেয়া বৈধ নয়।

وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ.

"তোমাদের সম্পদ নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৮)।

www.pathagar.com

অবশ্য জাতীয় স্বার্থে মালিকানা দখল করা বৈধ হলেও মালিককে সেজন্য অবশ্যই ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিও অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তাকে পৃথিবীর সাত স্তর নীচে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে" (বুখারী, মাজালিম, বাব ইছমি মান জালামা; ফাতহুল বারী, ৫/১০৩)।

জাতীয় মালিকানার সম্মান যেমন অপেক্ষাকৃত বেশী, তেমনি তার ওপর আগ্রাসনও কঠিনতর গুনাহ। কেননা এটা গোটা সমাজের ওপর আক্রমণের শামিল এবং গোটা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাকতকার নামান্তর। "যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি, অতঃপর সে সেখান থেকে একটা সুঁচ বা তার চেয়ে বেশি কিছু গোপন করে, সেটা হবে একটা খেয়ানত এবং সেই খেয়ানত সহকারেই সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে" (আবু দাউদ, খারাজ, বাব ফী রিযকিল উম্মাল, ৩/১৩৪, ৩/৩০০)। "একবার বলা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি শহীদ হয়েছে। তিনি বললেন : কখনো নয়। আমি তার চুরি করা একটি জামাসহ তাকে জাহান্নামে দেখেছি। তারপর বললেন : হে উমার! ঘোষণা করে দাও, মুমিনরা ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তিনবার" (মুসলিম, ঈমান, বাব গালাযি তাহরীমিল গুলূল, ২/১২৭)।

১৭– শ্রমিকের অধিকার

"কাজ" একটা শ্লোগান, যা ইসলাম তার সমাজের স্বার্থে তুলেছে।

وَقُلِ اعْمَلُوْا

"তুমি বল, তোমরা কাজ করো" (সূরা আত্-তাওবা : ১০৫)।

ইসলাম প্রত্যেকটি কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করারও তাগিদ দিয়েছে। মহানবী (সা) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করে তখন তা সুষ্ঠুভাবে করুক, এটাই আল্লাহ পছন্দ করেন" (মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, বুয়ূ, বাব নুসাইল উজীর ওয়া ইতকানিল আমাল, ৪/১০১)।

বস্তুত শ্রমিকের অধিকার হলো–

১- কোন ধরনের গড়িমসি ও যুলুম না করে তার শ্রমের ন্যায়সংগত পারিশ্রমিক দেয়া। মহানবী (সা) বলেন, "শ্রমিককে তার দেহের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দাও" (ইবনে মাজা, রাহূন, বাব আজরিল উজারা, ২/৮১৭)।

২- তার শ্রম ও কষ্টের সাথে সংগতিপূর্ণ সম্মানজনক জীবনের ব্যবস্থা করা ।

www.pathagar.com

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا.

"প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজ অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে" (সূরা আল-আহকাফ : ১৯)।

৩- গোটা সমাজ যেন তাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেয় তা নিশ্চিত করা।

اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ.

"তোমরা কাজ করো। আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের কাজ দেখবেন" (সূরা আত্-তাওবা : ১০৫)।

মহানবী (সা) বলেন, "আল্লাহ শ্রমজীবী মুমিনদের পছন্দ করেন" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, বুয়ূ, বাবুল কাসবি ওয়াত-তিজারাত, ৪/৬৫)।

৪- শ্রমিমকে শোষণ ও বঞ্চনা থেকে রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান। রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো । যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করলো, তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করলো, যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করলো, তারপর তার মূল্য ভোগ করলো এবং যে ব্যক্তি শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করলো, অতঃপর তার কাছ থেকে পুরোপুরিভাবে কাজ আদায় করলো, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক দিলো না" (ইবনে মাজা, রাহূন, বাব আজরিল উজারা, নং ২৪৪২)।

১৮– জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অধিকার

জীবনের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন খাদ্য-পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, শারীরিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্য রক্ষায় যা প্রয়োজন, যথা জ্ঞান, তথ্য ও সংস্কৃতি জাতীয় সম্পদের সীমার মধ্যে যতটা সম্ভব, পূরণ করার নিশ্চয়তা লাভ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে। যেখানে ব্যক্তি একাকী তার এসব মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সমর্থ নয়, সেখানে তার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা জাতির দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

"নবী মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও উত্তম অভিভাবক" (সূরা আহযাব : ৬)।

১৯– পরিবার গঠনের অধিকার

(ক) ইসলামী বিধান অনুসারে বিবাহ করা প্রত্যেক মানুষের অধিকার। এটাই পরিবার গঠন, বংশবিস্তার ও চারিত্রিক সততা বজায় রাখার একমাত্র আইনানুগ পন্থা।

www.pathagar.com

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً.

"হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষটি থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দু'জন থেকে বহু নারী ও পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন" (সূরা আন-নিসা : ১)।

স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি শরীআত নির্ধারিত কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

"স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। আর পুরুষদের জন্য স্ত্রীদের ওপর মর্যাদা রয়েছে" (সূরা আল-বাকারা : ২২৮)।

পিতার অধিকার রয়েছে নিজের শরীআত ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয়, নৈতিক ও শারীরিকভাবে সন্তানের লালন-পালনের। সন্তানদেরকে কোন্ দিকে পরিচালিত করবে সেটা নির্ধারণ করা পিতার দায়িত্ব। "তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেকে তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" (হাদীস)।

(খ) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই অধিকার রয়েছে পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে যথাযথ সম্মান লাভের এবং নিজ নিজ আবেগ ও অবস্থানের যথাযথ মূল্যায়নের।

وَمِنْ أَيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন; যেন তোমরা তার কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আর-রূম : ২১)।

(গ) স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য না করে পর্যাপ্ত ব্যয় করা

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللّهُ.

www.pathagar.com

"সামর্থ্যবান যেন তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে, আর যে জীবিকার অনটনে পতিত, সে যেন আল্লাহ তাকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করে" (সূরা আত্-তালাক : ৭)।

(ঘ) প্রত্যেক সন্তানের তার পিতামাতার কাছ থেকে এ অধিকার পাওনা রয়েছে, যেন তারা সুষ্ঠুভাবে তার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

"বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতামাতার ওপর সেইভাবে দয়া করো, যেভাবে তারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন" (সূরা আল-ইসরা : ২৪)।

শৈশবে শিশুদেরকে শ্রমে নিয়োগ ও এমন কাজে খাটানো অবৈধ যা তাদের জন্য অতিশয় কষ্টকর বা তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে বা তাদের লেখাপড়া ও খেলাধুলার অধিকার বিঘ্নিত করে।

(ঙ) শিশুর পিতামাতা যখন তার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তখন এই দায়িত্ব সমাজের কাঁধে স্থানান্তরিত হয় এবং শিশুর ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুসলমানদের কোষাগারের ওপর, যা রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার। মহানবী (সা) বলেন, "আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম তত্ত্বাবধায়ক, যে ব্যক্তি ঋণ অথবা দুর্বল ঝুঁকিযুক্ত সন্তান রেখে যাবে, তার দায়দায়িত্ব আমার ওপর। আর যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের" (আবু দাউদ, ফারাইদ, ৩/১২৩)।

(চ) পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার রয়েছে তার যা কিছু প্রয়োজন, তা পরিবারের কাছ থেকে পাওয়ার। যেমন বস্তুগত প্রয়োজন, স্নেহ মমতা, লালন পালন ও তদারকী, চাই তা শৈশবে হোক, বার্ধক্যে হোক বা পংগু অবস্থায় হোক। সন্তানদের ওপর পিতামাতার অধিকার রয়েছে যেন তাকে তাদের বস্তুগতভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে লালন পালন ও তদারকী করে। মহানবী (সা) বলেন, "তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার" (ইবনে মাজা, তিজারত, নং ২২৯১, মুসনাদ আহমাদ, ২/১৭৯)।

(ছ) পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ তদারকী পাওয়ার অধিকার রয়েছে মায়ের। "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার উত্তম সেবা লাভের সবচেয়ে বেশী অধিকার কার? তিনি বললেন : তোমার মায়ের। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলো, তারপর? বললেন :

www.pathagar.com

তোমার মায়ের। সে বললো : তারপর কার? বললেন : তোমার মায়ের। সে বললো : তারপর? বললেন : তোমার পিতার" (ইবনে মাজা, ওয়াসায়া, নং ২৭০৬, ২/৯০৩)।

(জ) পরিবারের দায়িত্ব তার সদস্যরা যৌথভাবে বহন করবে। প্রত্যেক সদস্য নিজ সামর্থ্য ও সহজাত প্রকৃতি অনুসারে তা বহন করবে। এ দায়িত্ব পিতামাতা ও সন্তানদের বৃত্ত অতিক্রম করে রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় ও অন্যান্য আত্মীয়দেরকেও এর আওতায় নিয়ে আসবে। "ইয়া রসূলাল্লাহ! কে আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? বললেন : তোমার মা, তারপরও তোমার মা, তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার পিতা। তারপর তোমার নিকটাত্মীয়, তারপর (অবশিষ্টদের) মধ্যে নিকটাত্মীয়" (তিরমিযী, বিরর, নং ১৯৫৯, ৩/২০৬)।

(ঝ) কোন যুবক বা যুবতীকে এমন কাউকে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, যাকে সে পছন্দ করে না। "এক যুবতী রসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, তার পিতা তার অপছন্দ পাত্রে তাকে বিবাহ দিয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. তাকে উক্ত বিবাহ মেনে নেয়া বা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা দিলেন (ইবেন মাজা, কিতাবুন নিকাহ, বাব ১২, ১৮৭৫; আরো দ্র. নং ১৮৭৩ ও ১৮৭৪)।

২০– স্ত্রীর অধিকার

(ক) স্বামী যেখানে থাকে স্ত্রী সেখানে তার সাথে থাকবে।

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ.

"তোমরা যেখানে বাস করো, সেখানে তাদেরকেও বাস করাও" (সূরা তালাক : ৬)।

(খ) গোটা দাম্পত্য জীবনকালব্যাপী স্বামী ন্যায়সংগত পন্থায় স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করবে। তালাক দিলে ইদ্দাতকালেও তার ব্যয়ভার বহন করবে।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

"পুরুষরা স্ত্রীদের ওপর কর্তৃত্বশীল। কেননা আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষরা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করেছে" (সূরা আন-নিসা : ৩৪)।

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

www.pathagar.com

"আর যদি স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়, তবে তাদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত তোমরা তাদের ব্যয়ভার বহন করো" (সূরা তালাক : ৬)।

স্ত্রীর অধিকারও রয়েছে যে, তার তালাকদাতার কাছ থেকে তালাকদাতার সেই সন্তানেরও ভরণপোষণ আদায় করবে, যে তার উদর থেকে জন্মেছে এবং সে তাকে লালন-পালন করবে। তাদের পিতার উপার্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এরূপ হারে তা আদায় করবে।

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

"স্ত্রীরা যদি তোমাদের সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তার পারিশ্রমিক দাও" (সূরা তালাক : ৬)।

(গ) স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক এবং তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি যতই থাকুক, সে এই সব ব্যয়ভার আদায় করার অধিকারী।

(ঘ) স্ত্রীর অধিকার রয়েছে স্বামীর কাছ থেকে আপোষে খুলার মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটানোর।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

"যদি তোমরা আশংকা করো যে, স্বামী ও স্ত্রী আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের উভয়ের কোন বাধা নেই। (সূরা আল-বাকারা : ২২৯)। অনুরূপ, স্ত্রী শরীআত সম্মত পন্থায় আদালতের মাধ্যমেও তালাক দাবি করার অধিকারী।

(ঙ) স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকার পাওনা রয়েছে, যেমন সে তার পিতামাতা, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়ের উত্তরাধিকার পায়।

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.

"তোমাদের সন্তান না থাকলে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ স্ত্রীদের প্রাপ্য, আর সন্তান থাকলে প্রাপ্য এক-অষ্টমাংশ" (সূরা আন-নিসা : ১২)।

(চ) স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য একজন অপরজনের অনুপস্থিতিতে তার (সম্পদ ও বিশ্বাসের) হেফাযত করবে, তার কোন গুপ্ত তথ্য ফাঁস করবে না এবং এমন

www.pathagar.com

কিছু প্রকাশ করবে না যাতে তার নৈতিক বা বৈষয়িক ক্ষতি হয়। এ অধিকার তালাকের সময় ও তারপর পরস্পরের আচরণ দ্বারা নিশ্চিত হয়।

وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ.

"তোমরা নিজেদের মধ্যে সৌজন্য ও মহানুভবতা ভুলে যেও না" (সূরা আল-বাকারা : ২৩৭)।

২১– লালন-পালনের অধিকার

(ক) উত্তম লালন-পালন পিতামাতার কাছে সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার। অনুরূপ সদাচরণ ও সহৃদয়তা সন্তানদের নিকট পিতামাতার প্রাপ্য অধিকার।

وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

"তোমার প্রতিপালক হুকুম দিয়েছেন, তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার উপস্থিতিতে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ্ বলবে না, তাদেরকে ধমক দিবে না, বরং তাদের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলবে। আর তাদের দু'জনের জন্য বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও মমতা সহকারে এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের ওপর সেইরূপ দয়া করো, যেরূপ দয়া সহকারে তারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করেছিল" (সূরা আল-ইসরা : ২৩ ও ২৪)।

(খ) শিক্ষা সকলের অধিকার। আর জ্ঞান অন্বেষণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কর্তব্য।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয" (ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ২২৪, ১/৮১)।

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার রয়েছে শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার।

www.pathagar.com

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَلَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ.

"যখন আল্লাহ কিতাবধারীদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করলেন, কিতাবকে তোমরা মানুষের কাছে প্রচার করবে, গোপন করবে না। কিন্তু এ অংগীকারকে তারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ স্বার্থ খরিদ করলো। তারা যা খরিদ করে তা কত নিকৃষ্ট" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৭)!

মহানবী (সা) বলেন, "আর যারা আজ উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে এ বাণী পৌঁছে দেয়" (বিদায় হজ্জের বাণী)।

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষা লাভ করা ও আলোকিত হওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সরবরাহ করা সমাজের দায়িত্ব। মহানবী (সা) বলেন "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী। আল্লাহই দাতা" (তিরমিযী, ইলম, নং ২৭৮৩, ৪/১৩৭)। আর প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে এমন বিষয় নির্ধারণ করার, যা তার মেধা ও সামর্থ্যের সাথে সংগতিশীল। মহানবী (সা) বলেন, "যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা তার জন্য সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে" (ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, নং ৭৮, ১/৩০)।

২২- নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের অধিকার

মানুষের গোপন তথ্য শুধু তাদের স্রষ্টার কাছেই উন্মুক্ত। মহানবী (সা) বলেন, "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছ?" (ইবনে মাজা, ফিতান. ২/১২৯৬)। মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোও সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়। তা অনুসন্ধান করা বৈধ নয়। وَلَا تَجَسَّسُوْا. "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না" (সূরা হুজুরাত : ১২)।

মহানবী (সা) বলেন, "যারা বাচনিক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি, তারা শোন! মুসলমানদেরকে বিব্রত করো না, লজ্জা দিও না, তাদের গুপ্ত তথ্য অন্বেষণ করো না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাই-এর গোপন তথ্য অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তার গোপন তথ্য অনুন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার গোপন তথ্য অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপমানিত করেই ছাড়বেন। এমনকি তা যদি তার বাহক জন্তুর পেটের ভেতরেও লুকানো থাকে" (তিরমিযী, বিরর, বাব তা'জীমিল মুমিন, নং ২১০১)।

www.pathagar.com

২৩– আবাসন ও অভিবাসনের অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে স্বাধীনভাবে চলাফেরার, স্থানান্তরে যাওয়ার, নিজ জন্মস্থান থেকে অন্যত্র হিজরত করার, স্থায়ীভাবে অভিবাসী হওয়ার এবং পুনরায় জন্মস্থানে ফিরে আসার। এতে তাকে কোন রকম বাধা দেয়া বা হয়রানী করা বৈধ নয়।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ.

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য সুগম করেছেন। কাজেই তোমরা তার দিকে দিকে যাতায়াত করো এবং তাঁর দেয়া জীবিকা আহরণ করো" (সূরা মুলক : ১৫)।

قُلْ سِيْرُوْا فِى الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তার পর দেখ, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের কেমন পরিণত হয়েছে" (সূরা আল-আনয়াম : ১১)।

أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا.

"আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না যেথায় তোমরা হিজরত করতে" (সূরা আন- নিসা : ৯৭)?

মানবাধিকারের দ্বিতীয় উৎস

জাতীয় উৎস

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ সম্বলিত ইসলামী শরীআত সংবিধান, আইন, বিধিমালা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে আইন প্রণেতার জন্য এবং সেই সংবিধান, আইন, বিধিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যা দান ও বাস্তবায়নে বিচারকের জন্য মৌলিক উৎস গণ্য হয়ে থাকে।

আর মানবাধিকারের 'জাতীয় উৎস' ধর্মীয় উৎসের পরে দ্বিতীয় প্রধান মৌলিক উৎসরূপে গণ্য। আর মানবাধিকারের জাতীয় সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় এই উৎসটি আন্তর্জাতিক উৎসের ওপর অগ্রগণ্য হওয়ার কারণে এটি প্রাথমিক গুরুত্বসম্পন্ন বিবেচিত হয়ে থাকে। কেননা মানবাধিকার লংঘনের কোন ঘটনা সংঘটিত হলেই

www.pathagar.com

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তার আইনজীবী আভ্যন্তরীণ আইনে তার আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ অনুসন্ধানে বাধ্য হয়। যেহেতু এটাই মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রথম কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। আভ্যন্তরীণ আইন সংবিধান হোক, সাধারণ আইন হোক অথবা কোন অলংঘনীয় রীতি বা প্রথা হোক– মানবাধিকার রক্ষার জন্য কোন আন্তর্জাতিক আইনের শরণাপন্ন হবার আগে এটাই সর্বাগ্রে আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য আইন।

বস্তুত মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহে এটা একটা অপরিহার্য শর্ত। সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সিদ্ধান্ত শর্ত আরোপ করে যে, যে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ তুলবে, তাকে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের আন্তর্জাতিক উপায়-উপকরণের শরণাপন্ন হবার আগে সর্বপ্রথম প্রতিরোধ ও প্রতিকারের স্থানীয় ও আঞ্চলিক উপায়-উপকরণের সার্বিকভাবে শরণাপন্ন হতে ও সাহায্য নিতে হবে। (রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ৪১ নং ধারা, একই চুক্তির পরিশিষ্টে যুক্ত স্বেচ্ছামূলক প্রটোকলের ৫ নং ধারা এবং ১৯৭০ সালের ২৭ মে তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ থেকে ঘোষিত ১৫০ নং সিদ্ধান্তের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

লক্ষণীয় যে, জাতীয় উৎস জাতীয় পর্যায়েই রচিত হোক কিংবা আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ভাষান্তরিত হোক, তা সমান বিবেচিত হয়ে থাকে। আর সংবিধানের মানবাধিকার সংক্রান্ত ভাষ্যসমূহ, প্রচলিত আইন ও রীতি-প্রথায় এ সংক্রান্ত অনুসৃত নীতিমালা এবং জাতীয় আদালতসমূহ থেকে ঘোষিত রায়সমূহ সবই মানবাধিকারের জাতীয় উৎসের অন্তর্ভুক্ত।

যিনি জাতীয় উৎসে বিদ্যমান মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা করবেন, তাকে অবশ্যই ১৯৪৮ সালে ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণায় বিধৃত মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। যার বিশদ বিবরণ ১৯৬৬ সালের দুটো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে। তারপর তাকে অবশ্যই এসব ধারার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে হবে যে দেশে মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে সেই দেশের জাতীয় আইন, সংবিধান, রীতিপ্রথা ও আদালতের ঘোষিত রায়সমূহে।

জাতীয় আইন ও সংবিধানসমূহে সুস্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে মানবাধিকারের যেসব অংশের উল্লেখ দেখতে পাই তা নিম্নরূপ।

www.pathagar.com

জীবন ধারণের অধিকার

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণাগুলো এ অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এটিকে সুস্পষ্ট ভাষায় তার অঙ্গীভূত করেছে। অথচ তা করার কথা ছিল না। কেননা এটা মানুষের জন্মগত অধিকার, যা স্বয়ং আল্লাহ তাকে দান করেছেন। জাতিসত্তা বা বর্ণ ও বংশগত কারণে, আকীদা- বিশ্বাসজনিত কারণে, রাজনৈতিক কারণে বা ব্যক্তিগত কারণে কারো এই অধিকার নিয়ে যখন কেউ ছিনিমিনি খেলে এবং এ অধিকারকে হরণ ও পদদলিত করে, তখন অন্য কেউ নয়, স্বয়ং আল্লাহই তার বাঁচার অধিকার হরণ করেন।

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণার তৃতীয় ধারায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ষষ্ঠ ধারায়, মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইউরোপীয় চুক্তির দ্বিতীয় ধারায়, মার্কিন মানবাধিকার চুক্তির চতুর্থ ধারায়, মানবাধিকার ও জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত আফ্রিকান চুক্তির চতুর্থ ধারায় এবং ইসলামের মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণার প্রথম ধারায় জীবন ধারণের অধিকারের প্রতি অংগীকার ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবন ধারণের অধিকার কোন নিরংকুশ ও শর্তহীন অধিকার নয়। ন্যায়সংগতভাবে কোন ব্যক্তিকে জীবন ধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বৈধ হতে পারে। যেমন সার্বিক তদন্ত, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ও পর্যালোচনার পর পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা। আর এই মৃত্যুদণ্ডের রায় কখনো কখনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনার্থে পেশ করা হয়ে থাকে, যিনি দণ্ড ক্ষমা করা ও হ্রাস করার এখতিয়ার রাখেন।

গর্ভবতী মহিলার বিরুদ্ধে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। বিভিন্ন দেশের আইন ও সংবিধানের বিভিন্নতা অনুসারে এরূপ মহিলাকে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য তার সন্তানকে দুধ পান করানোর অবকাশও দেওয়া যেতে পারে। আর আঠারো বছরের চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য প্রমাণিত হলে স্বল্পবয়সী হওয়ার কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে কারাদণ্ড দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। অনিবার্য কারণ ব্যতীত গর্ভপাত নিষিদ্ধ করা ও গর্ভপাতকারী ও গর্ভপাতকারিণীকে শাস্তি দেয়া জীবন ধারণের অধিকার সংরক্ষণেরই আওতাভুক্ত।

www.pathagar.com

ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার একটা জন্মগত অধিকার এবং তা সুরক্ষিত। সন্দেহ সংশয়, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা জনিত অবস্থা এবং তদন্ত অনিবার্য হয়ে পড়ায় গ্রেফতার ও আটক করতে বাধ্য হওয়া ছাড়া এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এরূপ অবস্থায় গ্রেফতার ও আটক করতে হলেও তা করতে হবে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণা আইনের ধারাগুলোর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই এবং মানবাধিকার আইনের আন্তর্জাতিক উৎসের বক্তব্য ও ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ জাতীয় আইনের অধীন।

মানুষের সম্মান ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার

যে মানবাধিকার মানুষের জীবন ধারণ, স্বাধীনতা, সম্মান এবং যাবতীয় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে তার দেহ ও বিবেকের নিরাপত্তা বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। এ অধিকারগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অপরটির সাথে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং দমননীতি, যুলুম, স্বৈরাচার, অপমান ও নির্যাতন চালু থাকলে জীবন ধারণের অধিকার অর্থহীন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার প্রথম ধারা জন্ম, স্বাধীনতা ও সম্মানকে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত করে। অনুরূপ তৃতীয় ধারায়ও বলা হয়েছে, "প্রতেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে বেঁচে থাকার এবং তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার।"

পক্ষান্তরে পঞ্চম ধারায় বিষয়টির আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে ,

"কোন মানুষকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করা যাবে না, তাকে কোন নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত শাস্তি ও আচরণের শিকার করা যাবে না এবং তার মানহানি করা যাবে না।"

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণায় স্থান পেয়েছে ত্রিশটি বিস্তৃত ধারা, তন্মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে জীবন ধারণের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্মান ও নিরাপত্তার অধিকার। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলোকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সকল দেশ ও সকল পক্ষ দেশবাসীর সাথে ও দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের সাথে আচরণের সময় সহজেই আইনগতভাবে উক্ত ধারাগুলো অনুসরণ করতে পারে।

www.pathagar.com

সারকথা

মানবাধিকারের জাতীয় উৎস প্রথমত ইসলামী শরীআতের বিধিমালায় পাওয়া যায়। এরপর পাওয়া যায় আইনী ও সাংবিধানিক ভাষ্যসমূহে, ফৌজদারী কার্যবিধি সংক্রান্ত আইনগুলোতে, দণ্ডবিধি সম্বলিত আইনগুলোতে এবং অন্য সমস্ত আইনে, যা মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণায় উল্লিখিত মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। অনুরূপ ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি দু'টিতে এবং আভ্যন্তরীণ আইনী ভাষ্যগুলিতেও মানবাধিকারের জাতীয় উৎস পাওয়া যায়।

(কোন কোন দেশ মনে করে যে, মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ সনদের ব্যাখ্যামাত্র। এজন্য জাতিসংঘের বাধ্যবাধকতা থেকে এর বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করা হয়। আর তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ মানবাধিকার লংঘনের শামিল। আবার কোন কোন দেশ মনে করে যে, এই ঘোষণা জনগণের স্বার্থে দেশগুলোর ওপর কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। আর এই ঘোষণা জারী করার সময় এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করার ইচ্ছাও ছিলো না। অপর কতক দেশ মনে করে যে, সংবিধানে এই ঘোষণার বক্তব্য ও ভাষ্যধারা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উক্ত ঘোষণাকে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা দেয় না। যদিও সংবিধানের ও আইনের এই বিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এগুলো বাধ্যতামূলক হয়ে যায়)।

আর এই সমস্ত ভাষ্য, জাতীয় হোক বা আন্তর্জাতিক, একটি মৌলিক বিষয়ে একমত। সেটি হলো আইনের সার্বভৌমত্ব। কেননা আভ্যন্তরীণ পর্যায়ের সকল মানবাধিকার এর আওতাভুক্ত হয়ে যায় এবং এটি মানবাধিকারকে সকল আগ্রাসন ও হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে। দেশের ভেতরে শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ার কারণে এবং ব্যক্তির সাথে আচরণের ব্যাপারে একটি নির্ভরযোগ্য মৌলিক স্তম্ভ হওয়ার কারণে আইনের সার্বভৌমত্ব হলো সর্বসম্মত মূলনীতি।

মানবাধিকারের তৃতীয় উৎস

আন্তর্জাতিক উৎস

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক উৎস ইসলামী শরীআতের পর মানবাধিকারের সবচেয়ে প্রাচুর্যময় ও সমৃদ্ধ আইনী উৎস বিবেচিত হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে মানবাধিকারের পরিচয় ঘটেছে বেশ কিছু সোনালী যুগের সাথে। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

৬—

www.pathagar.com

ইসলামী যুগ। ইসলামের আবির্ভাব, প্রসার এবং এর প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিধিবিধান ও নৈতিক শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে বিশ্বের বিরাট অংশে তখন ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পক্ষান্তরে মানবাধিকার এমন যুগও প্রত্যক্ষ করে, যখন সে চরম অধঃপতন, অত্যাচার ও দুঃসহ অবস্থার শিকার হয়। আর এই অধঃপতন ও অত্যাচার আন্তর্জাতিক সমাজ ও তার আইনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমাদের এ শতাব্দীতে এর প্রতি বর্ধিত গুরুত্ব দিতে অনুপ্রাণিত করে। ফলে বেশ কিছু প্রাথমিক ও দুর্বল প্রচেষ্টা শুরু হয়। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছু সংখ্যক নতুন রাষ্ট্রের পত্তনকারী চুক্তিতে সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু ঘোষণা প্রণীত হয়। তারপর ১৯১৯ সালের কিছু সাধারণ ম্যাণ্ডেটরী (তত্ত্বাবধায়ক) শাসন চুক্তির ভাষ্য এবং একই দিন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠন, তারপর ১৯২৬ সালের দাস ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ ও তার শাস্তি বিধান সম্বলিত চুক্তি এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য।

এইসব তৎপরতা ব্যতীত বিভিন্ন দেশ তার অধিবাসীদের সাথে তার নিরঙ্কুশ ও অবাধ আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্বের ভিত্তিতে আচরণ করতে থাকে, যা সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার হস্তক্ষেপ ও বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ছিল। কোন দেশে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় ও বিধিবিধানে ভিন্ন দেশের হস্তক্ষেপ ঘটতো কেবল তখনই, যখন উক্ত দেশ তার প্রজাদের সাথে খারাপ আচরণ করতো।

আর দেশে দেশে সরকার কর্তৃক জনগণের সাথে আচরণ ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘনের কারণে বাধ্য হয়ে মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখতে ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তা মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে অন্তর্ভুক্ত আইনের মাধ্যমে গৃহীত ব্যবস্থা এর একটি উদাহরণ। এই মানবাধিকার সনদে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক দেশ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক সমাজের নিকট দায়বদ্ধ, আর এই অধিকারগুলো সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশে হস্তক্ষেপ করা আন্তর্জাতিক সমাজের অধিকার ও কর্তব্য। (মানবাধিকার সনদের ধারাগুলো, বিশেষত ১, ৪, ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ২৪, ২৫, ৩৪, ৩৯, ৫৫, ৫৬, ৬২, ৬৮ ও ৭৬২ নং ধারায় এ অধিকারগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে)।

জাতিসংঘ সনদের পর পর্যায়ক্রমে আরো বহু আন্তর্জাতিক সনদ ঘোষিত হয়েছে, যা মানবাধিকার রক্ষাকে একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

করেছে। মানবাধিকারের এই সকল সনদ ও উৎস দুই প্রকারের : আন্তর্জাতিক ও মহাদেশীয়।

মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক উৎসসমূহ

এই সকল উৎসের মধ্যে রয়েছে সাধারণভাবে মানবাধিকারের উল্লেখ সম্বলিত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ। এইসব আন্তর্জাতিক সনদ আবার দু'ধরনের : সরকারী আন্তর্জাতিক সনদ বা ঘোষণাপত্র এবং বেসরকারী আন্তর্জাতিক সনদ বা ঘোষণাপত্র।

প্রথমত, সরকারী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ : এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। আর ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে এই সনদের বিশ্লেষণ ও এর ধারাগুলোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতিসংঘ সনদের ভূমিকায় কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরছি :

"আমরা জাতিসংঘভুক্ত জাতিসমূহ"

"প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যত মানবগোষ্ঠীকে আমরা যুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে মুক্ত করবো, যা মাত্র এক মানবগোষ্ঠীকে মধ্যেই দু'বার মানবজাতিকে এমন দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব"। আমরা নতুন করে ঘোষণা করছি মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি, মানুষের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের এবং ক্ষুদ্র জাতি ও বৃহৎ জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির সমান অধিকারের প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থা ও অটুট বিশ্বাস। আমরা আরো ঘোষণা করছি, আমরা সামষ্টিক উন্নয়নের জন্য সামনে এগিয়ে যাবো এবং প্রশস্ততর স্বাধীনতার পরিবেশে জীবন যাপনের মান আরো উন্নত করবো।"

এই ভূমিকার পর সনদের প্রথম ধারা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে। প্রথম অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উল্লেখ করা হয়। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় জাতিসংঘের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা। সেটি হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, যার ওপর বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার দুটোই নির্ভরশীল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করা হয়েছে মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখতে এবং সমুন্নত রাখার প্রতি সকলকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে জাতিসংঘের আগ্রহ। আর মানবাধিকারে জাতীয়তা, ভাষা ও ধর্ম এবং নারী ও পুরুষে কোন বৈষম্য না করার

www.pathagar.com

প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সনদের ৫৫, ৫৬ ও ৬০ নং ধারায় উক্ত আগ্রহ ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬২ নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে মানবাধিকারের প্রচার ও বাস্তবায়নের কাজ করার জন্য সুপারিশ পেশ করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। আর তৃতীয় অনুচ্ছেদের মাধ্যমে উক্ত পরিষদকে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন চুক্তির খসড়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপস্থাপনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

আর ৬৮ নং ধারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদকে প্রয়োজনীয় কমিটিসমূহ গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। অর্পিত এই দায়িত্ববলে উক্ত পরিষদ ১৯৬৪ সালে মানবাধিকার কমিটি গঠন করেছে। আর এই কমিটি মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি ও ঘোষণাপত্রের খসড়া তৈরি করে সাধারণ পরিষদের সামনে পেশ করেছে। সাধারণ পরিষদ সেগুলিকে অনুমোদন করেছে এবং এগুলোর ওপর সকল দেশ স্বাক্ষর করেছে, যাতে তা মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনী দায়িত্বে পরিণত হয়।

মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। একটি ৭২৮ নং সিদ্ধান্ত যা ঘোষিত হয়েছে ১৯৫৯ সালের ৩০ জুলাই তারিখে। অপরটি ১৫০৩ নং সিদ্ধান্ত যা ১৯৭০ সালের ২৭ মে তারিখে ঘোষিত হয়েছে। এ দুটো সিদ্ধান্ত মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেয় এমন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট যে কোন দেশে দৈহিকভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে মর্মে অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতা প্রদান করে। মহাসচিবের দায়িত্ব হলো, তিনি এগুলোকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা মানবাধিকার কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। সেখানে একটি টাস্ক ফোর্স* বৈষম্য রোধ ও সংখ্যালঘু রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি উপকমিটি, মানবাধিকার কমিটি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের মাধ্যমে এসব অভিযোগের তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানবাধিকার সমস্যাটি গোটা বিশ্বমানব সমাজের সমস্যা, কেবল সংশ্লিষ্ট দেশের শাসক গোষ্ঠীর একচেটিয়া ক্ষমতার বিষয় নয় যে, অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সমস্যার মত এগুলোতেও তারা পূর্ণ স্বাধীনতাসহ

*টীকা : ১৯৭২ সালের ৩০ জুলাই থেকে ১১ আগষ্ট পর্যন্ত এই টাস্কফোর্স সর্বপ্রথম বৈঠকে বসে এবং বিশ হাজারের বেশী অভিযোগ পর্যালোচনা করে উপকমিটির নিকট রিপোর্ট দেয়। উপকমিটি এই রিপোর্ট ও টাস্কফোর্স কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণকৃত কতিপয় অভিযোগ পর্যালোচনা করে।

www.pathagar.com

একক ও নিরংকুশ ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করবেন। এ কারণেই কোন দেশের জন্য বৈধ নয় ভোট কারচুপির নির্বাচন করা, অভিযুক্ত বা শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে দৈহিক নির্যাতন করা, নিষ্ঠুর আচরণ করা, অপমানজনক আচরণ করা অথবা তাদের পরিবারের কতক সদস্যকে আটক করা, যাতে অভিযুক্তরা স্বেচ্ছায় কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা দেয়।

দু'টি আন্তর্জাতিক অংগীকার

যেহেতু জাতিসংঘ সনদের বিষয়বস্তুই ছিল কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং মানুষের সাধারণ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা, সেহেতু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদ ও তার অধীনস্থ মানবাধিকার কমিটি জাতিসংঘ সনদে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহকে আইনী বিধিমালার আকারে প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (দেখুন Activites de l'onu dans le domaine des droits de l'homme n. 4. New York 1986, page 8)।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দুটো সাধারণ চুক্তি প্রণয়ন করে, যা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত আইনী বিধিমালা সম্বলিত। মানবাধিকার কমিটিতে এ দু'টি চুক্তির খসড়া প্রণীত হয়। তারপর এর ওপর আরো গবেষণা চলে সাধারণ পরিষদের অধীনস্থ সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সংক্রান্ত তৃতীয় কমিটিতে। আর ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে সাধারণ পরিষদ এ দু'টি আন্তর্জাতিক চুক্তিকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দান করে। এর একটির নামকরণ করা হয় "অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অংগীকার" এবং "নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও ভোটাধিকারের প্রটোকল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অংগীকার।"

১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রটোকলের পাশাপাশি এই দু'টি চুক্তিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞগণ "মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক আইন" নামে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯৭৬ সালে এই চুক্তি দু'টি ও প্রটোকলের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। "অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক অংগীকার" বলবৎ হয়েছে ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারী এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অংগীকার ও তার সাথে সংযুক্ত ভোটাধিকার প্রটোকল বলবৎ হয় ১৯৭৬ সালের

www.pathagar.com

২৩ মার্চ। আর এ চুক্তি দুটোর বাস্তবায়ন শুরু হওয়া প্রমাণ করে এ দু'টির প্রতি বহু সংখ্যক দেশের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে। এই আন্তর্জাতিক আইন সদস্য দেশগুলোর সরকারগুলোর জন্য মানুষের সাথে আচরণে আন্তর্জাতিক আইনের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করে।*

(১) আন্তর্জাতিক অংগীকারদ্বয়ের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক অংগীকার দু'টি চারটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও একটি ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পদের উৎসের স্বাধীন ব্যবহারের অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে জাতিগুলোকে প্রাচীন ও আধুনিক উপনিবেশবাদের প্রতাপ থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এই ভিত্তিটির বাস্তবায়ন খানিকটা দুষ্কর। কেননা এটা জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা বৃহৎ দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে। তাছাড়া এটা বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাকার দেশগুলোর আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকাস্থ প্রভাব-প্রতিপত্তি উচ্ছেদ ও উপনিবেশসমূহ থেকে দ্রুত পাততাড়ি গুটানোর দাবি জানায়।

(২) মানুষকে মানুষের প্রাচীন প্রভুত্ব ও পরাক্রম থেকে মুক্তি প্রদান। এজন্য দাস ব্যবসা, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ও বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়। লক্ষণীয় যে, শেষোক্ত কলংকটি এখানো কোন কোন ইউরোপীয় দেশ ও আমেরিকায় বিদ্যমান। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, শেষোক্ত দেশটি এখনো পর্যন্ত উল্লিখিত অংগীকার দু'টিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে চলেছে। অথচ সে প্রায়ই যে কোন প্রসঙ্গে দাবি করে যে, সে সারা বিশ্বে মানবাধিকারের রক্ষক। আরো লক্ষণীয় যে, 'কেবলমাত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির চেষ্টা সাধনারই ফসল হলো উক্ত আন্তর্জাতিক অংগীকার দু'টি।

(৩) মানুষের সাধারণ অধিকারগুলোকে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করার মাধ্যমে মানুষকে সরকার, প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করা।

---

*টীকা : ১৯৮৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর নাগাদ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক অংগীকারে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ছিল নব্বই। তন্মধ্যে তিরাশিটি দেশ এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেছে। আর নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বলিত চুক্তিতে সাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ছিয়াশী। তন্মধ্যে একাশিটি দেশ এটিকে অনুমোদন করেছে। আর ভোটাধিকার প্রটোকলকে অনুমোদন করেছে বত্রিশটি দেশ।

www.pathagar.com

(৪) নারী, শিশু ও বৃদ্ধ প্রভৃতি দুর্বল শ্রেণীর মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জোরদার করার মাধ্যমে যথাসাধ্য দুর্বল মানুষকে তার দুর্বলতার কারণগুলো থেকে মুক্তি প্রদান। লক্ষণীয় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ ভিত্তিদ্বয় প্রধানত তৃতীয় বিশ্বের উদ্দেশে নিবেদিত। কেননা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণে মানবাধিকার লংঘিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বেসরকারী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসমূহ

বেসরকারী আন্তর্জাতিক সনদগুলো দ্বারা আমরা সেইসব আন্তর্জাতিক সনদ বুঝাচ্ছি, যা প্রণয়ন করেছে জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত অংগ সংস্থাগুলো, অতঃপর তাতে স্বাক্ষর দান ও অনুমোদনের জন্য এবং সেগুলিকে মানবাধিকারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক আইনী উৎসরূপে গণ্য করার জন্য সদস্য দেশগুলোর সামনে পেশ করা হয়েছে। অনুমোদন হলো, আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের সর্বশেষ পর্যায়। কোন দেশের প্রতিনিধিরা যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, সেই চুক্তিকে ঐ দেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার নামই অনুমোদন।

সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত দলীল বিনিময়ের মাধ্যমে এই অনুমোদন সম্পন্ন হয়। এই দলীলে সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকে, দেশগুলো চুক্তিটির ধারাগুলো বলবৎ করার মাধ্যমে তার প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য ঘোষণা করেছে ও তা গ্রহণ করেছে (রাজনৈতিক বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, আবদুল ওহাব আল-কায়ালী, শিরো. তাসদীক, আল-মুওয়াসসাতুল আরাবিয়্যা লিদ-রিদাসাত ওয়ান-নাশর)।

এই সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষকালে আরো কিছু মানবাধিকার চুক্তি যুক্ত হয়, যা প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস। এই সকল চুক্তির কয়েকটি শ্রেণীর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

১– অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের নিরাপত্তার জন্য মানবাধিকার চুক্তি

বহু সংখ্যক নারী, শিশু, বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধী মানুষ, বৃদ্ধ, পংগু, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যগণ, বিদেশী, অভিবাসী, শ্রমিক, শরণার্থী ও নাগরিকত্বহীন মানুষেরা বিশেষ তদারকী ও নিশ্চিত নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। একাধিক আন্তর্জাতিক ঘোষণা প্রকাশ, এইসব ঘোষণাকে চুক্তিতে রূপান্তর ও তাতে দেশগুলোর স্বাক্ষর ও অনুমোদন সংগ্রহের চেষ্টার মাধ্যমে জাতিসংঘ তাদের তদারকী ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় প্রয়াস পেয়েছে। এসব বেসরকারী আন্তর্জাতিক চুক্তির কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

www.pathagar.com

১- মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ চুক্তি : ১৯৪৯

২- নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫২

৩- নাগরিকত্বহীন লোকদের অবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫৪

৪- বিবাহিত নারীর নাগরিকত্ব সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৫৭

৫- নাগরিকত্ববিহীন অবস্থা হ্রাসকরণ সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৬১

৬- নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান চুক্তি : ১৯৬৭

৭- শরণার্থী সংক্রান্ত বিশেষ চুক্তি : ১৯৫১ এবং প্রটোকল : ১৯৬৭

৮- বিবাহে সম্মতি, বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন চুক্তি : ১৯৮২

৯- শিশু অধিকার চুক্তি : ১৯৮৯

লক্ষণীয়, জাতিসংঘ মানবাধিকার সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ ধরনের ঘোষণাপত্র জারী করেছে। তন্মধ্যে ১৯৭১ সালে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র এবং ১৯৭৫ সালে প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। আর ১৯৮২ সালের ২৬ জুলাই থেকে ২৬ আগষ্ট পর্যন্ত ভিয়েনায় প্রবীণদের সমস্যা নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে সাধারণ পরিষদ এ সম্মেলনের রিপোর্ট অনুমোদন করে এবং এর মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারগুলোকে অনুরোধ জানায়।

২- নির্দিষ্ট অধিকারসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট চুক্তি

এ চুক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো সুনির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এসব অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত। এইসব অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, এ অধিকার সংরক্ষণ করা এবং এই সংরক্ষণকে বাস্তব রূপ দানের জন্য আন্তর্জাতিক উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করা। এসব চুক্তির কয়েকটি নিম্নরূপ :

১- দাসত্ব বিলোপ চুক্তি ১৯২৬, প্রটোকল ১৯৫৩, পরিপূরক চুক্তি ১৯৫৬

২- ট্রেড ইউনিয়ন চুক্তি ১৯৪৮ ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার সংরক্ষণ চুক্তি ১৯৪৯

৩- গণহত্যা রোধ ও গণহত্যার শাস্তি সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪৮

৪- বেগার শ্রম নিষিদ্ধ চুক্তি : ১৯৫৭

৫- চাকুরী ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ চুক্তি : ১৯৫৮

www.pathagar.com

৬– সর্বপ্রকারের বর্ণবৈষম্য বিলোপ ও তার শাস্তি সম্বলিত আন্তর্জাতিক চুক্তি : ১৯৬৫

৭– ঐ ১৯৭৩

৮– কর্মচারীদের রাজনীতি সংক্রান্ত চুক্তি : ১৯৬৪

৯– শ্রম সম্পর্ক চুক্তি : ১৯৭৮

১০– নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ, পাশবিক, অবমাননাকর ও অমানুষিক শাস্তিরোধ চুক্তি : ১৯৮৪

(৩) সশস্ত্র সংঘর্ষকালীন বাস্তবায়নযোগ্য চুক্তিসমূহ

এসব চুক্তিকে "জেনেভা আইন" নামে অভিহিত করা হয়। কেননা এগুলো জেনেভায় রচিত হয়েছিল, যেখানে রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটির সদর দফতর অবস্থিত। এই কমিটিই এই আইন রচনা ও এর বিকাশ সাধন করেছিল এবং এ আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের জন্য জেনেভাকে সদর দফতর করেছিল। এই চুক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত আইনী বিধিসমূহকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর বিপরীত হলো যুদ্ধ আইন বা লাহাই আইন। কেননা লাহাই ছিল যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত চুক্তি প্রণয়নকারী সম্মেলনগুলোর স্থান, বিশেষত ১৮৯৯ ও ১৯০৭ সালের সম্মেলনের স্থান। জেনেভা আইন ও লাহাই আইন সশস্ত্র সংঘর্ষকালীন আন্তর্জাতিক মানবিক বিধিমালা নির্ধারণে পরস্পরের পরিপূরক।

এই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উদ্দেশ্য হলো, সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব মানুষ শত্রুর কর্তৃত্বাধীন, তাদের দুর্ভোগ লাঘব করা, চাই এসব মানুষ আহত, রোগী, সমুদ্রে ভাসমান, ক্ষতিগ্রস্ত এবং সামরিক বা বেসামরিক যুদ্ধবন্দী যাই হোক না কেন (ফ্রাঁসোয়া য়িয়োরী, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের উৎপত্তি ও বিকাশ, জেনেভা থেকে প্রকাশিত, ১৯৮৪খৃ.)।

অন্য সংজ্ঞা অনুসারে 'আন্তর্জাতিক মানবিক আইন' দ্বারা সেইসব আইনের সমষ্টিকে বুঝায়, যা সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় সংঘর্ষের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ পোহানো লোকদেরকে রক্ষা করে এবং সামরিক তৎপরতার সাথে যাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তাদেরকে সর্বাধিক উদার ও ব্যাপক ভিত্তিক রক্ষাকবচ সরবরাহ করে (ষ্ট্যানিশলাভ আনহেলিক : আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সারসংক্ষেপ, রেডক্রসের আন্তর্জাতিক পত্রিকা, জুলাই ১৯৮৪খৃ.)।

www.pathagar.com

এই সংজ্ঞা অনুসারে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষের সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধেও তা প্রযোজ্য। এসব সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ মাত্রেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন কর্তৃক সরবরাহকৃত মানবীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী। নিম্নলিখিত চুক্তিগুলোতে এই সাহায্যের উল্লেখ পাওয়া যায় :

১– ১৯৪৯ সালের প্রথম জেনেভা চুক্তিতে রণাঙ্গনে আহত ও রোগগ্রস্ত সেনাসদস্যদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সাহায্য সম্পর্কে।

২– ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয় জেনেভা চুক্তিতে সাগরে নিমজ্জিত, রোগাক্রান্ত ও আহত সেনাসদস্যদের অবস্থার উন্নয়নে সাহায্য সম্পর্কে।

৩– ১৯৪৯ সালের তৃতীয় জেনেভা চুক্তিতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে।

৪– ১৯৪৯ সালের চতুর্থ জেনেভা চুক্তিতে যুদ্ধকালে বেসামরিক লোকদের সুরক্ষা সম্পর্কে।

৫– জেনেভা চুক্তির সাথে সংযুক্ত ও আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সংক্রান্ত ১৯৭৭ সালের প্রটোকল।

৬– জেনেভা চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ও আঞ্চলিক সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সুরক্ষা সংক্রান্ত ১৯৭৭ সালের দ্বিতীয় প্রটোকল।

এই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বা জেনেভা আইনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব ও তার কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত বহু বিধি ও বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব বিধি ৪২৯টি ধারায় বিস্তৃত। সেই সাথে ১৯৭৭ সালের দু'টি প্রটোকলের ১২৮টি ধারাও যুক্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের আঞ্চলিক আইনী উৎস

এ সকল উৎসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সাধারণ চুক্তি ও বিশেষ চুক্তি। এই দুই ধরনের চুক্তি বাস্তবায়ন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে এবং তা সাধারণ কোন আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক সংগঠনের অধীন পরিচালিত হয়।

মানবাধিকার সংক্রান্ত বহু সংখ্যক আঞ্চলিক চুক্তি ইউরোপ, আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও আরব বিশ্বে আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের অধীন সম্পাদিত হয়েছে। এসব চুক্তি আধুনিক আইনী উৎসরূপে গণ্য হয়ে থাকে, যেমন গণ্য হয়ে থাকে ইতিপূর্বে বর্ণিত আন্তর্জাতিক উৎসসমূহ। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সাধারণ ও বিশেষ চুক্তিগুলোর বিবরণ দেয়া গেলো, যা প্রত্যেক মহাদেশে ও অঞ্চলে চালু রয়েছে।

প্রথমতঃ আফ্রিকা মহাদেশে

১– সাধারণ চুক্তি*

ইউরোপীয় পরিষদের সদস্য দেশগুলো মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৯৫০ সালের ৪ নভেম্বর এবং তা কার্যকর হতে শুরু করে ১৯৫৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে। বর্তমানে একুশটি দেশ এ চুক্তির আনুগত্য করে। যথা ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী, ইটালী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, গ্রীস, তুরস্ক, সাইপ্রাস, মাল্টা, স্পেন, পর্তুগাল ও লেষ্টান্টাইন।

এ চুক্তিতে পশ্চিম ইউরোপীয় মানবাধিকারের সাধারণ চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকর থাকায় প্রমাণিত হয়, একটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আধুনিক আইন হিসাবে এটি কত মর্যাদাপূর্ণ। কেননা এ আইনের কথায় ও কাজে এবং আদর্শে ও বাস্তবে মিল রয়েছে। এই সাধারণ চুক্তির সাফল্যের সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ হলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে যেখানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চালু ছিল, সেখানে আজ ইউরোপ তা থেকে মুক্ত। এ চুক্তি অনুযায়ী মানুষ হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে সব কিছুর ভিত্তি। মানুষ উৎপাদন, সমৃদ্ধি, ন্যায়বিচার, শান্তি ও নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ।

---

*টীকা : এই বিষয়ের ওপর নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য : ইউরোপীয় পরিষদের প্রকাশনাসমূহ : স্ট্রাসবার্গ : ৮৭, এরিক হ্যারিমোসকৃত মানবাধিকার চুক্তি : ১৯৮৬; ড. একিহার্ড মুলার কৃত "মানবাধিকার ও ফৌজদারী আদালতে ইউরোপীয় পরিষদের ভূমিকা, হেলসিংকীতে মানবাধিকার সম্মেলনে পেশকৃত প্রতিবেদন, ১৯৮৬, সারাগোযা : ১৯৮৫।

www.pathagar.com

শুধু তাই নয়, ইউরোপ আরো এক ধাপ এগিয়ে মানুষের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার দিকে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ১৯৫১ সালের প্যারিস চুক্তি ও ১৯৫৭ সালের রোম চুক্তির অধীন ইউরোপীয় সংঘ গড়ে তুলেছে।

পূর্বোল্লিখিত সাধারণ চুক্তির পাশাপাশি এই দু'টি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত মৌলিক অধিকার ছাড়াও তার সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

ইউরোপীয় মানবাধিকার চুক্তি ও প্রটোকলসমূহ যদিও মানবাধিকার সংরক্ষণে একটা ব্যাপক ব্যবস্থা, তথাপি তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এজন্য এর পূর্ণতাদানে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ইউরোপীয় পরিষদের অধীন। নির্দিষ্ট সংখ্যক অধিকারকে সংহত করার প্রয়োজনে সম্পাদিত এসব চুক্তির মধ্যে রয়েছে ১৯৬১ সালের ১৮ অক্টোবর ইটালীর তুরীনে সম্পাদিত ইউরোপীয় সামাজিক চুক্তি এবং ১৯৮৭ সালের ২৬ নভেম্বর ষ্ট্রাসবুর্গে দৈহিক নির্যাতন, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি নিষেধকল্পে সম্পাদিত চুক্তি।

এসব চুক্তিতে যেসব অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মর্যাদা লাভের অধিকার, বসবাস ও চিঠি আদান-প্রদানের অধিকার, চিন্তা, বিশ্বাস, ধর্ম ও বাকস্বাধীনতা, সম্মেলনের স্বাধীনতা, সমিতি গঠনের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার, বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের সমতা, মালিকানা, শিক্ষা, নির্বাচন, স্থানান্তর গমন এবং বসবাসের জায়গা নির্বাচনের অধিকার। এসব চুক্তিতে নির্যাতন, অমানুষিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড, দাসত্ব, গোলামী ও অতিমাত্রায় কষ্টকর শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দণ্ডবিধিতে আদিমতা ও পাশবিকতা না থাকা, প্রজাদেরকে বিতাড়িত না করা এবং বিদেশীদেরকে দলগতভাবে বহিষ্কার না করার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। (এ অধিকারগুলো সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় পরিবারের মালিকানা এবং সামগ্রিক ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা বলে গণ্য করা হয়েছে। –এরিক হারিমোস)

২– বিশেষ চুক্তিসমূহ

ইউরোপ মহাদেশে বহু সংখ্যক বিশেষ চুক্তি চালু রয়েছে। এর দু'টি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

(ক) ইউরোপীয় সামাজিক চুক্তি

এই চুক্তি ইউরোপীয় পরিষদের দেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত হয় ইটালির তুরিনে ১৯৬১ সালের ১৮ অক্টোবর। এ চুক্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে অধিকারটি নিয়ে আলোচনা করেছে তা হলো, জ্ঞানার্জন ও বিজ্ঞান চর্চার অধিকার, এর প্রয়োজনীয় শর্তাবলী, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অধিকার, কর্মক্ষেত্রের কিছু স্বাস্থ্যগত শর্তাবলী, কাজের ন্যায়সংগত বিনিময় বা পারিশ্রমিক লাভের অধিকার, শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার্থে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের অধিকার, সামষ্টিকভাবে বিরোধিতার অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার, শিশু-কিশোরদের বিশেষ নিরাপত্তার অধিকার, কর্মজীবি নারীর বিশেষ নিরাপত্তার অধিকার, কারিগরি ট্রেনিং-এর অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, সামাজিক সাহায্য ও চিকিৎসার অধিকার, পংগু ও প্রতিবন্ধীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সামাজিক পুনর্বাসনের অধিকার, পরিবারের সামাজিক, আইনী ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার, শিশু ও মায়েদের এসব সুবিধা পাওয়ার অধিকার, যে কোন সদস্য দেশের যে কোন অঞ্চলে কাজ করার অধিকার, শরণার্থী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তার ও সাহায্য লাভের অধিকার।

(খ) নির্যাতন, অমানুষিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি নিষিদ্ধকরণে ইউরোপীয় চুক্তি

এই চুক্তিটি ইউরোপীয় পরিষদের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৭ তারিখে সম্পাদিত হয়। এতে রয়েছে একটি মুখবন্ধ ও তেইশটি ধারা। এতে অতিরিক্ত যে জিনিসটি রয়েছে তা হলো, নির্যাতন এবং অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তির বিরুদ্ধে মানুষের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ আমেরিকায় সাধারণ চুক্তিসমূহ

এ হচ্ছে আমেরিকার মানবাধিকার। দু'টি মৌলিক মার্কিন দলীলে এর আন্তর্জাতিক ও আধুনিক আইনী উৎস বিদ্যমান। যথা :

১– ১৯৪৮ সালের বোগোটা চুক্তি

এ চুক্তিই এর সংশোধনীগুলোসহ আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা গঠন করে। ১৯৬৭ সালের বুয়েনস আয়ারসের সংশোধনীগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৮ তারিখে বোগোটায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৫১ সালের ১৩ ডিসেম্বর। অবশেষে এটি আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থার

www.pathagar.com

সংবিধানের রূপ লাভ করে। এ চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত ছিল। এতে মানবাধিকারের বিশদ বিবরণ ছিলো না। এর ভূমিকায় কেবল এসব অধিকারের দিকে কিছু ইঙ্গিত ছিল। তারপর কিছু ইঙ্গিত ছিল তৃতীয় ও ষোলতম ধারায়ও। কিছু ইঙ্গিত ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসন, সুবিচার ও স্বাধীনতার দিকেও। তারপর ১৯৬৭ সালে এর ব্যাপক সংশোধন হয়। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার এসব সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

২– ১৯৬৯ সালের মার্কিন মানবাধিকার চুক্তি!

এ চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয় ১৯৭৮ সালের ১৮ জুলাই। তারপর থেকে এ চুক্তি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। যে দেশগুলো এ চুক্তিকে সমর্থন দেয়, তারা এ আইনের আনুগত্য করে। মার্কিন রাষ্ট্র সংস্থার একত্রিশটি সদস্য দেশের মধ্য থেকে উনিশটি দেশ এর প্রতি সমর্থন জানায়। সেগুলি হলো : আর্জেন্টিনা, বারবাডোস, বলিভিয়া, কলাম্বিয়া, কোষ্টারিকা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, ইকুয়েডর, এল সালভাডর, গ্রানাডা, গুয়াতেমালা, হাইতি, হণ্ডুরাস, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, পানামা, পেরু, উরুগুয়ে ও ভেনিজুয়েলা।

এই চুক্তির ধারার সংখ্যা বিরাশি। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ধারা হলো, নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি সদস্য দেশগুলোর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি এবং এ চুক্তি বাস্তবায়নের উপায় খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়তঃ আফ্রিকায় :[২]

আফ্রিকা মহাদেশ মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক আধুনিক আইন প্রবর্তনকারী তৃতীয় মহাদেশ। ১৯৮১ সালের ২৪ জুন নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন মানবাধিকার ও জাতিসমূহের অধিকার সম্বলিত আফ্রিকান চুক্তি বা ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এই চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু হয় ২১ অক্টোবর, ১৯৮৭।

টীকা-১ : দেখুন "মানবাধিকার সুরক্ষায় ও বিকাশে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা" –ইবরাহীম আল-আনাঈ, কায়রো ১৯৭৯।

টীকা-২ : আফ্রিকার মানবাধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত দলীলগুলো দ্রষ্টব্য :

– এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন

– মানবাধিকারের আঞ্চলিক সুরক্ষা– ড. ইসামুদ্দীন বাসীম, আফ্রিকার অবস্থার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থার সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা, কায়রো ১৯৮৭, এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন ১৯৮৬ -৮৭।

– আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার বিবৃতি, সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ-১৯৮৫।

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এই চুক্তি অনুমোদনকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় একত্রিশে। আফ্রিকান দেশের মোট সংখ্যা হলো পঞ্চাশ। এই চুক্তির প্রথম ধারা অনুযায়ী আফ্রিকান দেশগুলো চুক্তির বিধিসমূহ ও ঘোষণাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য। আফ্রিকার যে সকল সংগ্রামী ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তাদের চেষ্টার সাফল্যেরই প্রতীক এই চুক্তি। আফ্রিকায় মানবাধিকার ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সাবেক সেনেগালী প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেদার সেঙ্গোর ও জাতিসংঘের অবদান অবস্মরণীয়। আফ্রিকান চুক্তি তার মৌলিক চরিত্রের দিক দিয়ে মার্কিন মানবাধিকার চুক্তি ও ইউরোপীয় মানবাধিকার চুক্তিতে বর্ণিত মানবাধিকার থেকে পৃথক নয়।

আফ্রিকান চুক্তির ভূমিকায় আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার সনদ, জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বরাত দেয়া হয়েছে। সেই সাথে বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আফ্রিকান জাতিসমূহের স্বাধীনতা লাভের অধিকারের কথা, বিদেশী সামরিক ঘাঁটিসমূহ উচ্ছেদের কথা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করার কথা।

ভূমিকার পর চুক্তির ধারাগুলোকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

আফ্রিকান মানবাধিকার চুক্তি

প্রথম অংশ

অধিকার ও কর্তব্যসমূহ ২৬টি ধারা সম্বলিত, যা দুটো অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানবাধিকার ও জাতিসমূহের অধিকার, যা মৌলিকভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে বর্ণিত নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে পৃথক নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিবারের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচিত হয়েছে, বিশেষত সর্বাবস্থায় পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন, তাদের ভরণপোষণ ও প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য করার কথা। সেই সাথে ব্যক্তির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংশ

এই অংশে রয়েছে মানবাধিকার সংরক্ষণের উপায় ও পন্থাসমূহ, মানবাধিকার ও জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত আফ্রিকান কমিটি গঠন ও সংহতকরণ এবং উক্ত কমিটির সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য, মূলনীতি ও পদক্ষেপসমূহ।

তৃতীয় অংশ

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার মহাসচিবের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ।

তিনটি মানবাধিকার চুক্তি বা সনদের তুলনামূলক পর্যালোচনা

লক্ষণীয় যে, এই তিনটি মানবাধিকার চুক্তি শক্তিমত্তা, সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য, কাঠামোগত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের দিক দিয়ে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। এ তিনটির ভেতরে উৎকৃষ্টতম মানে রয়েছে ইউরোপীয় চুক্তি। সাংগঠনিক দিক দিয়ে এটি সবচেয়ে শক্তিশালী। কারণ এর ধারাগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারে এমন উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থাবলী এর ভেতরেই রয়েছে। "মানবাধিকার কমিটি", "মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালত" এবং সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ব্যাপারে ব্যক্তির অধিকার –এ তিনটি উপকরণের মধ্য দিয়ে এর ধারাগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। ইউরোপে মানবাধিকারের প্রতি সক্রিয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনে উৎসাহিত করার মত পরিবেশ ব্যাপকভাবে বিরাজ করায় মানবাধিকার বাস্তবায়ন এখানে এতটা সহজ হয়েছে। কেননা এখানে সকল পর্যায়ে প্রশাসন আইনের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বে বিশ্বাস করে এবং ইউরোপীয় মানবাধিকার কমিটি ও আদালতের ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে।

আমেরিকান মানবাধিকার চুক্তিতে যদিও আমেরিকান মানবাধিকার কমিটি ও আদালতের নিরংকুশ কর্তৃত্বের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইউরোপীয় কমিটি ও আদালত যে ধরনের সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, মার্কিন মানবাধিকার চুক্তি বাস্তবায়নে ল্যাটিন আমেরিকায় তার কোন তুলনা নেই।

পক্ষান্তরে আফ্রিকান মানবাধিকার চুক্তি সাধারণভাবে সারা বিশ্বে এবং বিশেষভাবে আফ্রিকা মহাদেশে মানবাধিকার বাস্তবায়নের রূপরেখা হিসাবে গণ্য। মার্কিন ও ইউরোপীয় চুক্তির তুলনায় এটি তৃতীয় পর্যায়ের। কেননা এতে মানবাধিকার

www.pathagar.com

সংক্রান্ত কোন আফ্রিকী আদালতের ব্যবস্থা নেই। তদুপরি মানবাধিকার বাস্তবায়নে আফ্রিকান সরকারগুলোকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে এর আইন প্রণয়নে দুর্বলতা বিদ্যমান।

এতদসত্ত্বেও আফ্রিকান মানবাধিকার চুক্তিটি আফ্রিকার দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বড় রকমের সাফল্য বিবেচিত হয়েই থাকবে। বিশেষত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এখনো যে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত, তার প্রেক্ষাপটে এ চুক্তি অন্ধকার মহাদেশে আলোর মিনার বিবেচিত হবে।

চতুর্থতঃ আরব বিশ্বে মানবাধিকার[১]

আরব বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণে পূর্বোল্লিখিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি বা সনদের মত আধুনিক কোন আরবীয় আইন বিদ্যমান নেই, যদিও সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রাচীনত্বে ও আধুনিক নগর সভ্যতায় তা যথেষ্ট অগ্রসর।

এ ক্ষেত্রে আরব লীগ যেটুকু সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তা পর্যাপ্ত নয়। কেননা ১৯৬৭ সালের বিপর্যয়ের পর জাতিসংঘের চাহিদার প্রেক্ষিতে যখন একটা স্থায়ী আরব মানবাধিকার কমিটি গঠন করা হলো তখন তাও যথার্থ চাহিদা পূরণ করেছে বলে মনে করা যায় না।[২]

আরব লীগের পরিষদ ১১ মার্চ, ১৯৭৯ তারিখে এই কমিটিকে মানবাধিকার সংক্রান্ত আরব সনদের খসড়া রচনা করার আদেশ দেয়। কমিটি ১৯৮২ সালের মে ও আগষ্ট মাসে এই খসড়া তৈরি করে। পরে আরব লীগ পরিষদ খসড়াটি আরব দেশগুলোর নিকট পাঠিয়ে দেয় তাদের মতামত ও মন্তব্যের জন্য। আরব দেশগুলো এ কাজে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। মাত্র চারটি দেশ সুদান, তিউনিসিয়া, কাতার ও বাহরাইন তাদের মন্তব্য ও মতামত পাঠায়। ১৯৮৩ সালে

টীকা-১ : ড. মুফীদ শিহাব, মানবাধিকারের আরবীয় সনদের খসড়া। সারাগোযাস্থ অপরাধ বিজ্ঞান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থায় অনুষ্ঠিত এক মানবাধিকার সম্মেলনে ১৯৮৮ সালের জুন মাসে এ শিরোনামে একটি নিবন্ধ পেশ করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। ইবরাহীম আল-আনায়ী, সাংগঠনিক ভূমিকা, প্রাগুক্ত।

টীকা-২ : আরব বিশ্বে মানবাধিকার ও জাতির অধিকার সংক্রান্ত সনদের খসড়া। সারাগোযাস্থ অপরাধ বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনাসমূহ- ১৯৮৭; মুনযির গিবাওয়ী : আরব বিশ্বে মানবাধিকার ও জাতির অধিকার সংক্রান্ত সনদের খসড়া, একটি বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা। সারাগোযাস্থ ইনষ্টিটিউটে মানবাধিকার সম্মেলনে ১৯৮৮ সালের জানুয়ারীতে পেশকৃত একটি আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৪।

www.pathagar.com

উক্ত কমিটি এই মন্তব্যগুলো পর্যালোচনা করে, খসড়ার কিছু সংশোধন প্রস্তাব করে এবং পুনরায় আরব লীগের পরিষদের নিকট ফেরত পাঠায়। আর এই পরিষদ এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

কিছু বেসরকারী আরব উদ্যোগ

আরবীয় আইন শাস্ত্রের অধ্যাপকদের একটি দল মানবাধিকারের একটি ব্যাপক ভিত্তিক আরবীয় চুক্তির খসড়া রচনার চেষ্টা চালান এবং ইটালির সারাগোযা শহরে অপরাধ বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা ইনষ্টিটিউটে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার ও দণ্ডবিধির বিচার সংক্রান্ত সম্মেলনে তারা এই আগ্রহকে বাস্তব রূপ দেন। সম্মেলনে অধিকৃত ফিলিস্তীন ও বারোটি আরব দেশ থেকে ছিয়াত্তরজন শীর্ষস্থানীয় আরব ব্যক্তিত্ব সমবেত হন। উল্লিখিত আন্তর্জাতিক ইনষ্টিটিউটে প্রেরিত আবেদনে সম্মেলনে আগত ব্যক্তিগণ এই মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেন, যেন ইনষ্টিটিউট আরব বিশেষজ্ঞদের একটা সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন মানবাধিকারের একটি আরব সনদের খসড়া রচনা করবে। ইনষ্টিটিউট এই আগ্রহে সাড়া দেয় এবং ১৯৮৬ সালের ৫-১২ ডিসেম্বর এ উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। শেষ পর্যন্ত এই সম্মেলন আরব বিশ্বের জন্য একটি মানবাধিকার সনদের খসড়া রচনা করে। এই খসড়ায় একটা ভূমিকা ও ছাপ্পান্নটি ধারা রয়েছে। ধারাগুলোতে স্থান পেয়েছে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ, যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে তৈরি হয়েছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি আরব কমিটি এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি আরব আদালত উক্ত খসড়া তৈরি করে।

বিশেষ কয়েকটি আরব দলীল

একথা সুবিদিত যে, আরব জাতির জন্য একটি আধুনিক আইনী উৎস হিসাবে মানবাধিকারের কোন ব্যাপকভিত্তিক আরবী চুক্তি পাওয়া যায় না। তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে কিছু বিশেষ চুক্তি পাওয়া যায়, যার মধ্যে কিছু মানবাধিকার সংরক্ষণ করা হয়। যেমন :

- ১৯৪৫ সালের আরব সাংস্কৃতিক চুক্তি
- ১৯৬৪ সালের আরব সাংস্কৃতিক ঐক্য চুক্তি

www.pathagar.com

– ১৯৬৫ সালের শ্রম সংক্রান্ত আরব চুক্তি

– ১৯৫৭ সালের আরব অর্থনৈতিক ঐক্য চুক্তি এবং ১৯৬৪ সালের আরব সাধারণ বাজার চুক্তি।

– ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালের আরব শ্রম চুক্তি ও তার কৌশল

– আরব শিশুর অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি

আরব বিশ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এইসব চুক্তি ও সনদ, যা আরব লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত চল্লিশ বছরে সম্পাদিত হয়েছে, এতটা শক্তিশালী নয় যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের পর্যায়ে পৌছবে। কেননা এগুলো আরব মানবাধিকার প্রণয়নের সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট হয় এমন ইতিবাচক লক্ষণ প্রদর্শন করে না। এতটা শক্তিশালী যেটি হবে সেটিই হবে মানবাধিকারের আরব সনদ। এখানো এই আশা জাগ্রত রয়েছে যে, আরব লীগের অভ্যন্তরে যে খসড়া তৈরি হয়েছিল বা যে খসড়া সারাগোযায় আরব আইন বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে এই সনদ একদিন রচিত হবে। অথবা উক্ত দুই খসড়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি খসড়া অথবা অন্য কিছুর ভিত্তিতে মানবাধিকারের আরবী সনদ তৈরি হবে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক আইনী ধারাসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের পর্যালোচনা

মানবাধিকার বহু সংখ্যক ও বহুবিধ। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো– জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার ও ন্যায়বিচারের অধিকার। এসব অধিকারের মধ্য থেকে আমরা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার অধিকারকে বেছে নিচ্ছি।

১– ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার

ন্যায়বিচার একটা আদর্শগত বিষয়, যা মানুষের সকল অধিকার সংরক্ষণ করে, চাই মানুষ হিসাবে হোক অথবা দণ্ডিত বা পুরস্কৃত ব্যক্তি হিসাবে হোক, আর যতক্ষণ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে নির্দোষ গণ্য করে।

শাসক ও শাসিতের মধ্যকার আচরণে মানুষের নির্দোষিতা একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ। একটি নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারিক আদালতের মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ আইনের চোখে নির্দোষ। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নির্দোষিতা মানুষের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ১১ নং ধারায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে :

১– যে ব্যক্তিকেই কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হোক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ নিশ্চিত থাকা অবস্থায় নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ গণ্য হবে।

২– কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কাজ করার দায়ে বা কাজ থেকে বিরত থাকার দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না, যে কাজ করা বা করা থেকে বিরত থাকার সময় জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ ছিলো না। অনুরূপ উক্ত অপরাধ যখন সংঘটিত হয়েছে, তখন তার যে শাস্তি বৈধ ছিল, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া কখনো বৈধ নয়।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪ নং ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে, তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধ গণ্য হওয়ার। আর এ কথা সুবিদিত যে, আইন অনুযায়ী অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একটা নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগত বিচার অনুষ্ঠান অপরিহার্য। ন্যায়সংগত ফায়সালায় উপনীত হওয়া যায় এমন বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যতীত ন্যায্য বিচার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা বাস্তাবয়িত হতে পারে না। এ ব্যাপারেই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪ নং ধারার ১ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

১– যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন শাস্তিযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হলে অথবা কোন নাগরিক দাবির ক্ষেত্রে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার নিষ্পত্তির সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যেন তার বিষয়টি নিয়ে আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রকাশ্যে ন্যায়নিষ্ঠভাবে বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত যে, বিশেষ আদালত, সামরিক আদালত এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রচলিত আদালতের মত প্রাপ্য সুবিচারের পূর্ণ নিরাত্তা দিতে পারে না।

২– ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সহজে ও সম্ভাব্য দ্রুত গতিতে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সুযোগ থাকা এবং অভিযুক্তকে অবিলম্বে বিচারে সোপর্দ করা অপরিহার্য। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির নবম ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদে।

৩– আটক বা গ্রেফতারকৃত শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অতি দ্রুত কোন বিচারকের নিকট অথবা আইনগতভাবে সরাসরি বিচার কার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত করতে হবে। এ ধরনের অভিযুক্তের অধিকার রয়েছে, একটা ন্যায়সংগত সময়ের মধ্যে তার বিচার অনুষ্ঠান করতে হবে অথবা তাকে মুক্তি দিতে হবে।

৪– আটক বা গ্রেফতার হওয়ার কারণে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার রয়েছে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। যাতে তার আটক বা গ্রেফতার হওয়া আইন সংগত হয়েছে কিনা তা দ্রুত নিশ্চিত হয়। বেআইনীভাবে গ্রেফতার হয়েছে প্রমাণিত হলে তার মুক্তির নির্দেশ দিতে হবে।

ন্যায় বিচারের দাবি হলো, কোন মানুষের বিচার অনুষ্ঠানের সময় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪ নং ধারা অনুযায়ী তাকে কয়েকটি মৌলিক নিরাপত্তা দিতে হবে। এই মৌলিক নিরাপত্তার সর্বনিম্ন সীমা হলো নিম্নরূপ :

১– অভিযুক্তকে অতি দ্রুত ও বিস্তারিতভাবে এবং যে ভাষায় সে বুঝতে পারে সেই ভাষায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তার কারণ তাকে জানাতে হবে।

www.pathagar.com

২– তাকে এতটা সময় ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, যা তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এবং তার পছন্দনীয় আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন ও যথেষ্ট।

৩– বিচার অনুষ্ঠানে অযৌক্তিক বিলম্ব করা যাবে না।

৪– অভিযুক্তের উপস্থিতিতে তার বিচার অনুষ্ঠিত হতে হবে, অভিযুক্ত যাতে নিজে অথবা তার মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার যদি আত্মপক্ষ সমর্থনকারী না থাকে তবে আত্মপক্ষ সমর্থনকারী উপস্থিত রাখার অধিকার তার রয়েছে এটা তাকে জানাতে হবে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে দাবি করলে আদালত তার ওপর কোন পারিশ্রমিকের দায় না চাপিয়ে তাকে একজন আইনজীবী সরবরাহ করবে যে তার পক্ষ সমর্থন করবে। অবশ্য উক্ত আইনজীবী যদি এই অভিযোগ প্রক্ষালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের অধিকারী না হয় তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

৫– অভিযোগের তথা বাদী পক্ষের সাক্ষীদেরকে সে নিজে জেরা করতে অথবা অন্যের মাধ্যমে জেরা করতে পারবে। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের ব্যাপারে যে শর্তাবলী প্রযোজ্য, সেই সব শর্তেই সে অভিযোগ প্রক্ষালনে সাফাই সাক্ষী হাজির করার অনুমতি অর্জন করার অধিকারী।

৬– সে বিনা ব্যয়ে একজন দোভাষী লাভের অধিকারী– যখন এমন অবস্থা হয় যে, সে আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বোঝে না বা সেই ভাষায় কথা বলতে পারে না।

৭– তাকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বা কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা যাবে না। যে অভিযুক্ত কোন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তার উচ্চতর আদালতে আপিল করার অধিকার থাকবে। হয়তো সেই আদালত নিম্ন আদালত থেকে ভিন্ন কোন রায় দিবে। চূড়ান্তভাবে নির্দোষ হিসাবে রায়প্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় বিচার অনুষ্ঠান করা আন্তর্জাতিক চুক্তির ৭-৮ ধারামতে বৈধ নয়। আর যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত চূড়ান্ত রায়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, অতঃপর নতুন প্রকাশিত প্রমাণ বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দ্বারা বিচারের ভুল ধরা পড়ার কারণে সেই রায় বাতিল হয় বা তার প্রতি বিশেষ ক্ষমা ঘোষিত হয়, তখন এই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া বাধ্যতামূলক, যদি প্রমাণিত না হয় যে, সে যথাসময়ে উক্ত প্রমাণ পেশ না করার জন্য আংশিকভাবে বা পুরোপুরিভাবে দায়ী।

www.pathagar.com

সারকথা

ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার মানুষের স্থায়ী জন্মগত অধিকার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অবস্থায় ও সকল আচরণে তার এ অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে। তার দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নীতিগতভাবে সে নির্দোষ বিবেচিত হবে। (তিউনিসের সাংবিধানিক আইনের ১২তম অধ্যায়ে, যা ১৯৫৯ সালের ১ জুন প্রকাশিত হয়েছে, বলা হয়েছে : "আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা সম্বলিত বিচার কার্যে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক অভিযুক্ত নির্দোষ বিবেচিত হবে")। আর যখনই তার অপরাধ প্রমাণিত হবে, তখন তাকে বিচারের পূর্বে, বিচার চলাকালে ও রায় ঘোষণার পরে, যত শীঘ্র সমীচীন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া অপরিহার্য।

২– স্বাধীনতার অধিকার

(ক) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা রয়েছে যে, কোন মতামত পোষণের এবং যে কোন ধরনের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস পোষণের। অনুরূপ কারো ক্ষতি না হয় বা কারো ওপর জোরজবরদস্তি না করা হয় এই শর্তে এইসব মতামত ও চিন্তাধারা প্রচার করারও অধিকার রয়েছে। (তিউনিসীয় সাংবিধানিক আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতাগুলোর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "তিউনিসীয় প্রজাতন্ত্র ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা এবং তার বিশ্বাসের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত না হলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে")।

বস্তুত একমাত্র মতামতের স্বাধীনতার ভিত্তিতেই মানুষের ব্যক্তিত্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে তা বিকশিত হয়। এ কারণেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৯ নং ধারায় অকুণ্ঠ চিত্তে মানুষের মতামত অবলম্বনের স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯ নং ধারায়। এতে বলা হয়েছে যে, কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই যে কোন মতামত পোষণের অধিকার সকল মানুষের রয়েছে।

মতামতের স্বাধীনতাই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক মানুষ, উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক মানুষ এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতভাবে সামষ্টিক জীবনের তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী মানুষ তৈরি করে।

www.pathagar.com

(খ) বাকস্বাধীনতা

সামষ্টিক জীবনে এই অংশগ্রহণ আরেকটি স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট। সেটি হলো বাকস্বাধীনতা। আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রের ১৯ নং ধারায় মতামতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই এটির উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটিকে একই মুদ্রার দুই পিঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা উভয়ের দাবী হলো, কাজের স্বাধীনতা। আর কাজের স্বাধীনতার দাবি হলো, গবেষণা, অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ, বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা ও কোন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধতা ছাড়াই তথ্য প্রচার করার স্বাধীনতা।

কিন্তু এ ধারাটি মতামতের স্বাধীনতাকে অবাধ ও সর্বাত্মক স্বাধীনতা বানিয়ে ফেলেছে। কোন ব্যক্তি বা প্রশাসন এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অথচ বাকস্বাধীনতাকে অবাধ ও সর্বাত্মক বানাতে পারেনি। বিভিন্ন রকমের বাধা ও শর্ত তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ নং ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ দু'টিতে রয়েছে :

১– প্রত্যেক ব্যক্তিই বাকস্বাধীনতার অধিকারী। এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তথ্য অনুসন্ধান, সর্ব প্রকারের চিন্তাধারার অন্বেষণ, সেগুলো সংগ্রহ করা এবং হস্তান্তর করার অবাধ স্বাধীনতা, চাই তা মৌখিকভাবে হোক, লিখিতভাবে হোক, ছাপানো আকারে হোক অথবা কোন মৌলিক কাঠামোতে বা অন্য কোন পছন্দসই মাধ্যমে হোক।

২– এই ধারার ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারগুলো ভোগ করা কতিপয় নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে উক্ত অধিকারগুলো ভোগ করা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের অধীন হতে পারে। তবে তা শুধুমাত্র আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য–

(ক) অন্যদের অধিকার অথবা সুখ্যাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে; এবং

(খ) জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা, জাতীয় শৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক নৈতিকতা রক্ষার তাগিদে।

বাকস্বাধীনতার পূর্বশর্ত হলো মতামত ও তথ্য সংগ্রহের অধিকার অর্জন করা। কেননা এই সমস্ত তথ্য বাকস্বাধীনতার ভিত্তি নির্মাণ করে। তাই এসব তথ্যের পর্যাপ্ত সূত্র থাকা প্রয়োজন, যথা প্রকাশনা, বেতার ও টিভির প্রচার, যোগাযোগ মাধ্যম, চিত্র ইত্যাদি।

www.pathagar.com

বাকস্বাধীনতা একটা ঝুঁকিপূর্ণ অধিকার বা স্বাধীনতা। কেননা জনমত ও দেশের ওপর এর প্রভাব রয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণার ১৯ নং ধারা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ নং ধারা এ স্বাধীনতাকে এই শর্ত আরোপ করে নিয়ন্ত্রিত করেছে যে, বাকস্বাধীনতা যেন লাল রেখা অতিক্রম না করে, যাতে বাকস্বাধীনতা দ্বারা উপকৃত হতে গিয়ে কেউ নিম্নলিখিত জিনিসগুলোর ক্ষতিসাধন করে না বসে–

১– অন্যদের অধিকার বা সুখ্যাতি;

২– জননিরাপত্তা;

৩– জনশৃঙ্খলা;

৪– জনস্বাস্থ্য;

৫– নৈতিকতা।

কর্তৃপক্ষ এসব সীমারেখার অপব্যবহার করতে পারে। এই সম্ভাব্য অপব্যবহার রোধের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি এ সীমারেখাকে আইনের ও প্রয়োজনের শৃঙ্খল দ্বারা শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। এর অর্থ হলো, রাষ্ট্রীয় তৎপরতাকে লাগাম দেয়া হয়েছে এবং এই সীমারেখাকে নিয়ন্ত্রিত করার মাধ্যমে যুলুম ও নির্যাতনের অবকাশ বিলোপ করা হয়েছে। আইন এটিকে নিয়ন্ত্রিত করে গণতন্ত্রের বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

(গ) চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৮ নং ধারায় একই ধারাবাহিকতায় এই তিনটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৮ নং ধারায় এর প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে।

কিন্তু নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তির ১২ নং ধারায় এসব স্বাধীনতার সাথে সমন্বয় সাধনকল্পে কিছু বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা চারটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ পেয়েছে–

১– চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। এই অধিকারের আওতায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং এককভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে নিজের মনোনীত ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারে, চাই তা উপাসনার মাধ্যমে হোক, নিজেকে তার রীতিনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বা তার বাস্তবায়ন বা শিক্ষাদানের মাধ্যমে হোক।

www.pathagar.com

২- কারো ওপর এমনভাবে বলপ্রয়োগ করা বৈধ নয়, যার কারণে তার যে কোন ধর্ম বা মনোনীত বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্নহয়।

৩- নিজের ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশে ব্যক্তির স্বাধীনতা শুধুমাত্র আইনে উল্লেখিত বিধিনিষেধ দ্বারা অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা, অন্যদের অধিকার বা মৌলিক অধিকার রক্ষায় যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন, সেসব বিধিনিষেধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪- আন্তর্জাতিক চুক্তির শরীক দেশগুলো নিজেদের বিশিষ্ট বিশ্বাস অনুযায়ী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে পিতা, মাতা ও আইনী অভিভাবকদের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে চুক্তিবদ্ধ।

সারকথা

মানুষকে আহবান জানানো হয়েছে যেন সে অন্য মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে। অনুরূপ দেশসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত ১৮ নং ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদের বাস্তবায়নও জরুরী। পিতা, মাতা ও আইনী অভিভাবকবৃন্দ কর্তৃক তাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সন্তানদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে চতুর্থ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

৩- দাসত্ব, গোলামী, বেগার শ্রম ও অনুরূপ অন্যান্য অনাচার

এগুলো সেই সব ক্ষেত্র, যেখান থেকে মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেননা এখানে কখনো কখনো মানুষের বেচাকেনাও হয়। একে বলা হয় দাস ব্যবসা। এটা বর্তমান বিশ্বে অবিকল এই আকৃতিতে যদিও বিরল, কিন্তু ভিন্ন আকৃতিতে অনেক জায়গায় চালু আছে। এটা প্রকৃত দাসত্ব থেকে তেমন ভিন্ন নয়, যেমন নারী ব্যবসা, বেশ্যাবৃত্তিতে তাদের নিয়োগ, মানবদেহের অংগ বেচাকেনা, শিশু অপহরণ ও তাদের অংগ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির জন্য নেয়া।

দাসত্বের সুপরিচিত প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চালু ছিল এবং আমাদের যুগ পর্যন্তও তা অব্যাহত রয়েছে। এর কারণে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। আমাদের এ শতাব্দীতে দাসত্ব নিষিদ্ধ করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক আইনী আন্দোলন চলছে। এ উদ্দেশ্যে দাস ব্যবসার ওপর শাস্তি বিধান এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮৮৯-৯০ সালে অনুষ্ঠিত ব্রুকসেল সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। সেখানে সদস্য

www.pathagar.com

দেশগুলো আফ্রিকার দাস কেনাবেচা বন্ধ করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। এরপর ১৯১৯ সালে ব্রুকসেলের সংকল্পকে সিদ্ধান্তের রূপ দিয়ে 'সানজারমান ইল লেই' চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তিতে সকল প্রকারের দাস ব্যবসার বিলোপ সাধন এবং জলে ও স্থলে দাস কেনাবেচা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এরপর ১৯২৬ সালে দাসত্ব ও দাসত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেগার শ্রম নিষিদ্ধ করে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর প্রথম ধারায় দাসত্ব ও দাস ব্যবসা নিরূপিত হয় নিম্নরূপ :

১– দাসত্ব হচ্ছে কোন ব্যক্তির এমন অবস্থার নাম, যে অবস্থায় তার ওপর পূর্ণ বা আংশিক মালিকানা থেকে উদ্ভুত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়।

২– দাস ব্যবসা এমন কর্মসমষ্টির নাম, যাকে কেন্দ্র করে কোন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বন্দী করা, দখল করা অথবা অন্য কারো নিকট হস্তান্তরের লক্ষ্যে তার ওপর থেকে দখল বা কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করা হয়। অনুরূপ কোন দাসকে বিক্রি বা বিনিময় করার উদ্দেশ্যে হস্তগত বা দখল করা, কোন দাসকে বিক্রি বা বিনিময় করার উদ্দেশ্যে তার ওপর থেকে নিজের দখল প্রত্যাহার করা এবং দাসদেরকে যে কোন ব্যবসায় বা হস্তান্তর জনিত কর্মকাণ্ডকে দাস ব্যবসায় বলা হয়।

উল্লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো দাস ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করা, এজন্য শাস্তি প্রবর্তন করা ও বেগার শ্রম নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

১৯২৬ সালের চুক্তি ১৯৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদর দফতরে লিখিত প্রটোকলে রূপান্তরিত করা হয়। এর মাধ্যমে সাবেক জাতিপুঞ্জের যাবতীয় ক্ষমতা জাতিসংঘ ও তার প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট হস্তান্তরিত হয়। আর ১৯৫৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর দাসত্ব, দাস ব্যবসা এবং দাসত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যাবতীয় রীতি প্রথা ও কর্মকাণ্ড বিলোপের উদ্দেশ্যে একটি পরিপূরক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এসব কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তার বিলোপের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেষ্টা-সাধনাকে সমন্বিত করার আহ্বান জানানো হয়। এই চুক্তির প্রথম ধারায় এ জাতীয় কয়েক ধরনের কর্মকাণ্ডের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়–

(ক) ঋণের বিনিময়ে বন্দী : এর অর্থ হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে তার ব্যক্তিগত সেবা প্রদানের জন্য তাকে যিম্মী করে রাখা অথবা এই সেবা প্রদানের মেয়াদ বা প্রকৃতি নির্ধারিত না হওয়া।

www.pathagar.com

(খ) আবাসিক দাসত্ব : প্রচলিত প্রথা, আইন বা ঐকমত্যের মাধ্যমে এই মর্মে সম্মত হওয়া যে, সে অন্য এক ব্যক্তির জমিতে বসবাস ও কাজ করবে এবং কোন বিনিময় দিয়ে বা বিনিময় ছাড়া এবং তার অবস্থার পরিবর্তনের কোন স্বাধীনতা লাভ করা ছাড়াই উক্ত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট কিছু সেবা দান করবে।

(গ) কোন মহিলাকে বিবাহ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দান অথবা কার্যত বিবাহ দেয়ার সময় তাকে বিবাহ প্রত্যাখ্যানের অধিকার না দেয়া এবং কোন আর্থিক বা বস্তুগত বদলা না দেয়া যা সে তার স্ত্রীর পিতামাতাকে বা অভিভাবককে বা পরিবারকে বা অন্য কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দেয়।

– স্বামীকে, স্বামীর পরিবারকে বা তার গোত্রকে কোন মূল্য বা বদলার বিনিময়ে এই অধিকার দেয়া যে, সে তার স্ত্রীকে অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করতে পারবে।

– স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে অন্যের নিকট হস্তান্তরযোগ্য উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে পরিণত করার সম্ভাব্যতা

– পিতামাতাকে, তাদের কোন একজনকে বা অভিভাবককে কোন কিছুর বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়া এই মর্মে সম্মত করা যে, আঠারো বছরের কম বয়স্ক কিশোরকে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে, যাতে উক্ত কিশোরকে বা তার কাজকে সে ভোগ করতে পারে (সমকালীন দাসত্বের বিভিন্ন রূপ, জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কেন্দ্র থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বেগার শ্রম ও বলপূর্বক শ্রমে নিয়োগের বিষয়টি ১৯৩০ সালের ২৮ জুন তারিখে নিষিদ্ধ করে। এর ৩৯ নং চুক্তির প্রথম ধারায় বলা হয়,

"আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সদস্য এই চুক্তি অনুমোদন পূর্বক যত অল্প সময়ে সম্ভব বেগার শ্রম ও বলপ্রয়োগমূলক শ্রম' নিষিদ্ধ করবে।"

দ্বিতীয় ধারায় বেগার শ্রম ও বলপ্রয়োগমূলক শ্রমের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়, যে কাজ বা সেবা কোন ধরনের শাস্তির হুমকি দিয়ে নিছক বলপ্রয়োগে কারো ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করতে প্রস্তুত ছিল না, তারই নাম বেগার শ্রম ও বলপ্রয়োগ জনিত শ্রম। বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরী এবং চুক্তির ভাষ্য অনুযায়ী নির্ধারিত আরো কয়েক ধরনের কাজ এর ব্যতিক্রম।

আর যেহেতু বেগার শ্রম রাজনৈতিক বিরোধী ও ধর্মঘটী শ্রমিকের শাস্তি হিসাবে বা বর্ণগত ফ্যাসিবাদী কর্মপন্থা হিসাবে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, তাই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৯৫৭ সালের ২৫ জুন ১০৫ নং চুক্তি প্রবর্তন পূর্বক বেগার শ্রম নিষিদ্ধ করে এবং ঘোষণা করে–

www.pathagar.com

"আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সকল সদস্য এই চুক্তি অনুমোদনের মাধ্যমে সব ধরনের বেগার শ্রম ও বলপ্রয়োগজনিত শ্রম নিষিদ্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা করানো হয়ে থাকে–

(ক) বলপ্রয়োগ ও রাজনৈতিক নির্দেশনার উপায় হিসাবে রাজনৈতিক মত পোষণের শাস্তি বা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশাসনের বিরোধিতার শাস্তি হিসাবে অথবা এই সব মত ও পথের ঘোষণা দেয়ার শাস্তি হিসাবে;

(খ) অথবা অর্থনৈতিক উৎপাদনের লক্ষ্যে শ্রমিকদেরকে জমায়েত করা ও কাজে নিয়োজিত করার উপায় হিসাবে;

(গ) শ্রমিকদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার উপায় হিসাবে;

(ঘ) আন্দোলন ও গোলযোগে অংশগ্রহণের শাস্তি হিসাবে;

(ঙ) বর্ণগত, সামাজিক, জাতিগত ও ধর্মীয় বৈষম্যের উপায় হিসাবে।

সমকালীন দাসত্বের কয়েকটি প্রকার হলো শিশুদেরকে অপহরণ, বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদেরকে আটক রাখা, সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার ও পাথর সরানোর কাজে তাদেরকে লাগানো, নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানো, দরিদ্র পরিবারের শিশুদেরকে ধনীদের নিকট বিক্রি করা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৪৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে এর প্রতিরোধ করে। ১৯৯০ সালে এই চুক্তি সম্পাদনকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ষাটে। এরপর ১৯৯০ সালে বিশেষভাবে শিশু অধিকার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে শিশুদেরকে উল্লিখিত কাজগুলো থেকে রক্ষা করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের অধীন একটি গ্রুপ সমকালীন দাসত্বের বিভিন্ন রূপ বিলোপের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ গ্রুপটি পাঁচজন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত। বর্ণবৈষম্যরোধ ও সংখ্যালঘু রক্ষা উপকমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে তাদেরকে বাছাই করা হয়। এই গ্রুপ প্রতি বছর এক সপ্তাহের জন্য বৈঠকে মিলিত হয় এবং উপকমিটির নিকট রিপোর্ট পাঠায়। এই গ্রুপ বিশ্বের দাসত্ব বিরোধী চুক্তিগুলির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা ছাড়াও প্রত্যেক বছর তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তাগবেষণা ও আলোচনা করে। যেমন ১৯৮৯ সালে তার বিষয় ছিল শিশু বিক্রি, শিশু বেশ্যাবৃত্তি এবং শিশুদের নিয়ে অশ্লীল প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা। আর ১৯৯০ সালে শিশু শ্রম ও ঋণ দাসত্ব বিলোপ। ১৯৯১ সালের বিষয়

www.pathagar.com

ছিল মানুষ বেচাকেনা ও বেশ্যাবৃত্তির বিলোপ। এই গ্রুপটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকর প্রকল্প প্রণয়ন করেছে, যাতে প্রথমোক্ত বিষয় দু'টি থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করা যায়। জেনেভাস্থ মানবাধিকার কমিটি ১৯৯০ সালে শিশু ব্যবসা, শিশু বেশ্যাবৃত্তি, শিশুদের নিয়ে অশ্লীল প্রকাশনা ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিশু দত্তক গ্রহণ সমস্যার সমাধানে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুসারে, যাতে শিশুদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট মানবাধিকার কমিটির নিকট পাঠানো হয়। আরো দু'টি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বেগার শ্রম পর্যবেক্ষণ, শরণার্থী শ্রমিকদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা রোধ, নারীদের জোরপূর্বক বিবাহ দেয়া, নারী ক্রয়বিক্রয়, যৌতুক জনিত হত্যাকাণ্ড, নারী শিশুর যৌনাংগ বিকৃত করা প্রভৃতি দাস সুলভ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। এই গ্রুপের কাজে এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের কাজে বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থাগুলো তথ্য প্রদান, বিবৃতি প্রদান ও দলীলাদি সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা দিচ্ছে। গ্রুপটির কাজে আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা দাসত্ব ও দাসত্বসদৃশ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেস্কো, ফাও, শরণার্থী সংক্রান্ত বিশ্বসংস্থা, জাতিসংঘ নারী কেন্দ্র কমিটি, জাতিসংঘ অপরাধ প্রতিরোধ ও দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন শাখা ও ইন্টারপোল।

সারকথা

দাসত্ব ও দাস ব্যবসার প্রাচীন ও আধুনিক সকল রূপ প্রতিরোধে বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চেষ্টা চালানো হয়েছে। এ চেষ্টা সার্বক্ষণিকভাবে ও অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং এর সাথে সকল মহলের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ও ব্যক্তির মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসা উচিত।

www.pathagar.com

অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অধিকার

ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য

ইসলামে শাস্তির উদ্দেশ্য কি তা জানতে হলে ইসলামী শরীআত ও আইনের উদ্দেশ্য কি তা আগে জানতে হবে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান চালাতে হবে। 'মাকাসিদুশ- শারীআহ' অর্থাৎ 'শরীআতের উদ্দেশ্য' স্বয়ং একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এর নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক হলেন এ কালের সুদক্ষ তিউনিসীয় আলেম অধ্যাপক শেখ ইমাম মুহাম্মদ আত-তাহের বিন আশূর (র)। বিভিন্ন শাস্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "হুদূদ, কিসাস, তা'যীর ও ইরশ ইত্যাদির আওতায় শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য তিনটি : অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের সান্ত্বনাদান এবং অপরাধপ্রবণ লোকদেরকে সতর্ক বা প্রতিহত করা।[১]

প্রথমটি অর্থাৎ অপরাধীকে সতর্ক করা ও শিক্ষাদান সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে মহৎ উদ্দেশ্য। এটি হলো মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের সংশোধন। এই সদস্যদের নিয়েই গোটা জাতি গঠিত। অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করা দ্বারা তার মন থেকে সেই নোংরা চিন্তা দূর করা যায় যা তাকে অপরাধ সংঘটিত করতে প্ররোচিত

---

১. আগেকার কালের আলেমদের মধ্যে বিশেষভাবে ইমাম শাতিবী (র) তাঁর গ্রন্থ "আল-মুয়াফিকাত"-এ, ইয্যুদ্দীন বিন আবদুস সালাম তাঁর গ্রন্থ "ফাওয়াইদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম" (সৃষ্টির কল্যাণে শরীআতের বিধান)-এ। সমকালীন আলেমদের মধ্যে আল্লাল আলফাসী তাঁর গ্রন্থ "মাকাসিদুশ শারীআতিল ইসলামিয়া ওয়া মাকারিমুহা" (ইসলামী শরীআতের উদ্দেশ্য ও মহত্ব)-এ, মুহাম্মাদ মুস্তাফা শালবী তাঁর গ্রন্থ "তা'লীমুল আহকাম" (ইসলামী আইনের শিক্ষা)-এ, সাঈদ রমযান আল-বূতী তাঁর গ্রন্থ "দাওয়াবিতুল মাসালিহা" (কল্যাণের নীতিমালা)-তে শরীআতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায় (গ্রন্থকার)।

হুদূদ, একবচন হদ্দ : শব্দটি দ্বারা কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধ ও তার জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে বুঝায়। যেমন মাদক সেবনের শাস্তি বেত্রদণ্ড।

কিসাস : মানবজীবন ও দেহের ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি।

তা'যীর : উপরোক্ত দু'টি শ্রেণীর অপরাধ বহির্ভূত যাবতীয় অপরাধ ও তার শাস্তি।

আরূশ : মানবদেহের কোন অঙ্গের ক্ষতিসাধনের কারণে যে অর্থদণ্ড আরোপ করা হয় তা (সম্পাদক)।

www.pathagar.com

করে। অপরাধটি প্রথমে ইচ্ছা ও কল্পনার পর্যায়ে থাকে। পরে অপরাধকর্ম সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা বাস্তবে রূপ লাভ করে। আল্লাহ শরীআতের হদ্দ কার্যকর করার পর অপরাধী সম্পর্কে বলেছেন :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ করার পর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন" (সূরা আল-মাইদা, আয়াত ৩৯)।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া ও সন্তুষ্ট করা প্রসংগে ইমাম মুহাম্মদ আত-তাহির বিন আশূর উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করলে তার বিরুদ্ধে শেষোক্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও ক্ষোভ জন্মে। আর যে ব্যক্তি ভুলক্রমে বা অনিচ্ছায় দুর্ঘটনা বশত কোন আঘাত করে তার ওপর অপেক্ষাকৃত কম হলেও ক্রোধ জন্মে। এর ফলে সে প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হয়। আর প্রতিশোধ কখনো ন্যায়নীতির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। কেননা প্রতিশোধ স্পৃহার জন্মই হয় বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে, যার ফলে বিবেক-বিবেচনা লোপ পায় এবং ন্যায়বিচারের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আর এভাবে ক্রমাগত প্রতিশোধ, আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। তাতে জাতির শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এজন্য ইসলামী শরীআতের লক্ষ্য হচ্ছে– সহিংসতায় লিপ্ত পক্ষগুলোকে সন্তুষ্ট করা, তাদের ক্ষোভ প্রশমন করা এবং প্রতিশোধের ধারাবাহিকতাকে থামিয়ে দেয়া।

ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের অন্তরে পুঞ্জীভূত প্রতিশোধ স্পৃহাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এ কারণে শরীআত নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের এই অধিকার বহাল রেখেছে যে, খুনীর বিরুদ্ধে আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হবার পর নিহতের অভিভাবকরা খুনীকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেবে, তার হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে বিচার বিভাগের নজরদারীর মধ্য দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে, যাতে তাদের মনকে খুশী করা যায় ও তাদের ক্ষোভ প্রশমিত করা যায়।

তৃতীয় বিষয় হলো– অপরাধপ্রবণদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা। এ সম্পর্কে ইবনে আশূ কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেন,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"মুমিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে" (সূরা আন-নূর, আয়াত ২)।

www.pathagar.com

ইবনুল আরাবী "আহকামুল কুরআনে" বলেছেন, "শাস্তি শাস্তিভোগকারীকে দমিয়ে দেয়, আর যারা উপস্থিত থেকে শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ও ভয় পায়। তারপর এ ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং তার দ্বারা পরবর্তী বংশধর উপদেশ লাভ করে। এটি ছিল শাস্তির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য উম্মাহর সদস্যদের সংশোধনের জন্য।

শাস্তির উদ্দেশ্য 'উম্মাহর সার্বিক সংশোধন' সম্পর্কে ইবনে আশূর বলেন, সর্বজনবিদিত বিধিমালার ভিত্তিতে অপরাধীদের ওপর শাস্তি কার্যকর করা ব্যভিচারী লম্পটদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও নিরুৎসাহিত করে। এ আলোচনা থেকে আমরা যা বুঝি তা হলো, শাস্তির প্রবর্তন হয়েছে মানুষকে 'অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখার' উদ্দেশ্যে। কেননা নিছক আদেশ দান ও নিষেধ করা মানুষকে আনুগেত্যে বহাল রাখা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। শাস্তি যদি না থাকতো, তাহলে আদেশ-নিষেধগুলো নিরর্থক হয়ে যেত। শাস্তির ভয় মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় প্রতিহত করে।

শাস্তি তার অন্তর্নিহিত হুমকি, হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা মানবীয় স্বভাবের সংশোধন সম্পন্ন করে থাকে। কেননা মানুষ যখন তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বার্থের পরিণামে অবধারিত শাস্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন স্বভাবগতভাবেই সে শাস্তিকে অপছন্দ করে। সুতরাং শাস্তিগুলো প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের কু-প্রবৃত্তি যা অপছন্দ করে তা করতে তাকে বাধ্য করার জন্য। কেননা তাতে জনগণের সামষ্টিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর শাস্তিগুলো চালু হয়েছে মানুষের কু-প্রবৃত্তি যা পছন্দ করে তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত রাখার জন্য। কেননা কুকর্মে নিহিত রয়েছে সমাজের বিকৃতি ও অকল্যাণ। এ দ্বারা রসূলুল্লাহ সা.-এর এ উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণিত হয়, "বেহেশত (কু-বৃত্তির) অপছন্দনীয় জিনিসগুলো দিয়ে ঢাকা রয়েছে, আর দোযখ ঢাকা রয়েছে মজাদার জিনিসগুলো দিয়ে" (দারিমী, রিকাক, বাব হাফফাতিল জান্নাত বিল-মুকারিহ, ১/৭৩৫)।

লক্ষণীয় যে, ইসলামী শরীআত মানব রচিত আইনের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণ রক্ষা করা, সমাজের শৃঙ্খলা বহাল রাখা ও সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। কিন্তু এই দৃশ্যমান ঐক্যমত সত্ত্বেও এই দুটোর মধ্যে দু'টি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত, ইসলামী শরীআত নৈতিকতাকে সমাজের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ বলে বিবেচনা করে। দ্বিতীয়ত, শরীআত হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর রচিত। তাই তাঁর বিধিগুলো চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে আধুনিক আইন মানবরচিত।

৮—

www.pathagar.com

তাই মানুষের মত ও স্বার্থ পরিবর্তনের সাথে সাথে তার রচিত আইনও পরিবর্তিত হয়।

এ আলোচনার পর আমরা ইসলামের শাস্তি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অপরিহার্য মনে করি।

ইসলামের শাস্তিব্যবস্থা

ইসলামের শাস্তিব্যবস্থা মৌলিকত্বে (অর্থাৎ ধার করা বা অন্যের অনুকরণে রচিত নয়), যুগোপযোগিতায় ও উপকারিতায় অন্য সকল শাস্তিব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। এতে বহু সংখ্যক উপাদান এমন রয়েছে, যা বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য নতুন ও প্রাচীন আইন বা দণ্ডবিধির মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার এতে এমন কতক উপাদানও রয়েছে, যা শুধু ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য, অন্য কোন আইনে তার অস্তিত্ব নেই।

ইসলামী শাস্তিব্যবস্থার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারটি উপাদান

১– অপরাধ থেকে বিরত থাকার জন্য মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ দান, অসৎ কাজের পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ, সৎ কাজের আদেশদান ও অসৎ কাজে বাধাদান।

এ উপাদানটি বিশ্বের অন্যান্য বিধি ব্যবস্থায়ও থাকতে পারে। কিন্তু ইসলামের সাথে এর সম্পৃক্ততা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও বহুমাত্রিক। কেননা ইসলাম এগুলোর ওপর অত্যধিক ও উপর্যুপরি গুরুত্ব দিয়েছে, যা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

২ ও ৩– দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান হলো 'হুদূদ ও কিসাস'। ইসলামের পূর্ববর্তী শাস্তিব্যবস্থাগুলোতে বিভিন্ন আকারে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু ইসলামে এর পদ্ধতি ও বিধিমালা পূর্ণতা ও স্বচ্ছতা লাভ করেছে। আর এ বিধিমালা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ প্রদত্ত, মানবরচিত নয়।

৪– তা'যীর : এটি ইসলামী শাস্তিব্যবস্থার একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, 'হুদূদ' ও 'কিসাস' স্বল্প সংখ্যক অপরাধ ও পাপাচারের শাস্তি, যেমন হত্যা, বিদ্রোহ, ইসলাম ত্যাগ, চুরি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ, মদপান, আহত করা, ডাকাতি ও নাস্তিকতা। কিসাসের বিধান স্পষ্টতই মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু হুদূদের বিধিগুলো আল্লাহ ও সমাজের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এগুলো ছাড়া আর যত ক্ষতিকর কাজ আছে তা সবই বৈধ। এর অর্থ হলো, এগুলোর (তা'যীরাধীন অপরাধের) সমুচিত শাস্তি নির্ধারণের

www.pathagar.com

দায়িত্ব আল্লাহ মানুষের ওপর ন্যস্ত করেছেন। সমাজের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির আলোকে এগুলো নির্ধারিত হবে।

ইসলামের তা'যীর বিধান প্রমাণ করে, মানুষের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে এবং সব কিছুই তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি। বরং অনেক কিছুই এমন রয়েছে, যার মধ্যে সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারে এবং নিজের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে।

আমরা যখন হুদূদ ও কিসাসের ক্ষেত্র ও তা'যীরের ক্ষেত্রের তুলনা করি, তখন দেখতে পাই যে, প্রথম দু'টি সংক্রান্ত বিধির সংখ্যা কম এবং তা'যীরের ক্ষেত্র অনেক বেশী প্রশস্ত ও ব্যাপক। হুদূদ ও কিসাস সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশাবলীর সংখ্যা কম থাকাই ইসলামের অভিপ্রেত। কেননা এ নির্দেশাবলী উপকারিতা ও প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখা ও বিবেককে বিচারকসুলভ ভূমিকা পালনের ক্ষমতা প্রদান। আইন ও বিধিমালার সংখ্যা বেশী হলেই অপরাধপ্রবণ লোকেরা শিক্ষা লাভ করবে –এ ধারণা সঠিক নয়। বরং সমাজে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তাবোধের পরিবেশ বিরাজ করলেই শিক্ষা লাভের সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়ে। আমাদের যুগের মানব রচিত আইনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, তাতে আইন ও বিধির আধিক্য এত বেশী যে, বিশাল বিশাল আইনী পুস্তকের আকারে তা লাইব্রেরীর শোভা বর্ধন করছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ আজো নিরাপত্তাবোধ, সুখ ও শান্তি থেকে বঞ্চিত।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট ইটালীয় অপরাধবিজ্ঞানী আনরে কোভেরী বলেছেন, *"আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত আইন ও সৎ মানুষের সমাজ দাও, আমি তোমাদের জন্য অপরাধের হার বিপুল পরিমাণে হ্রাসের নিশ্চয়তা দেব। আর আমাকে একটা উত্তম আইন ও অসৎ সমাজ দাও, আমি তোমাদের জন্য অপরাধের হারে বিপুল বৃদ্ধি নিশ্চিত করবো।"*

এ অবস্থাটা ইসলামই সবার আগে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে, যখন তার আইনের সংখ্যা ছিল কম, আর তার সমাজ ছিল সৎ। এ কথা কে না জানে যে, উমার ইবনুল খাত্তাব রা. পুরো এক বছর বিচারকের আসনে আসীন ছিলেন, অথচ এই সময়ে তার কাছে একটা অভিযোগও কেউ নিয়ে আসেনি।

ইসলামী আইনে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

অপরাধী ও অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অধিকার সর্বপ্রথম যে স্তরটি অতিক্রম করে তা হচ্ছে অভিযোগ দায়েরের স্তর। আর এ স্তরটির অত্যন্ত গভীর ও অটুট সম্পর্ক রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের সাথে। সেটি হলো ব্যক্তি

www.pathagar.com

স্বাধীনতার অধিকার। কেননা অভিযোগ দায়ের হওয়া মাত্রই মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। তার দোষী সাব্যস্ত হওয়া বা অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করার আগে এই হুমকির অবসান ঘটে না।

অভিযোগ দায়ের এমন দুই পক্ষের মধ্যকার সম্পর্কের নাম, যার একজন অপরাধী বা আক্রমণকারী আর অপরজন অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত ব্যক্তি। এই সম্পর্ক থেকে বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার ফলে উভয়ের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়। এই সম্পর্ক থেকেই এই মর্মে গুরুতর প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, অভিযোগ দায়ের করাটা কি অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা আক্রান্ত ব্যক্তির একচেটিয়া ও নিরংকুশ অধিকার? এতে কি রাষ্ট্র বা সমাজের কোনই অংশ নেই? অথবা এটা কি একচেটিয়াভাবে শুধু রাষ্ট্রের অধিকার এবং অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এতে কোন অধিকার নেই? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমরা অভিযোগের বিশ্লেষণ করবো এবং একে চার প্রকারে বিভক্ত করবো।

১– প্রথম প্রকার : অভিযোগ দায়েরের ব্যক্তিগত পদ্ধতি

এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পাওয়া যায়, যা জনগণকে সকল শক্তির উৎস গণ্য করে। এ ব্যবস্থা ফৌজদারী অভিযোগ দায়েরের অধিকার ও ক্ষমতা শুধুমাত্র ব্যক্তির একক অধিকার ও ক্ষমতা বলে স্থির করে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অপরাধ ও অভিযোগ দায়ের, উভয় কাজকে দুই ব্যক্তির মধ্যকার ঘটনা বলে মনে করা হয়। এতে রাষ্ট্রের কোন দায়দায়িত্ব বা করণীয় নেই। এ ব্যবস্থা অপরাধী ও অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয়ের অধিকার নিয়েই চিন্তাভাবনা করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের অধিকারকে অস্বীকার করে।

২– দ্বিতীয় প্রকার : অভিযোগ দায়েরের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতি ধর্মনিরপেক্ষ স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি শাসন ক্ষমতার উৎস বিবেচিত হয়ে থাকে। এজন্য অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরের ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের নিরংকুশ ক্ষমতায় পরিণত করা হয়েছে। এখানে অপরাধী ও অপরাধ সংক্ষুব্ধের কোন অধিকারের স্বীকৃতি নেই। এ ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে, রাষ্ট্র ও সমাজই প্রত্যেক অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, চাই তা যত নগণ্যই হোক। এ কারণেই এ ব্যবস্থায় এরূপ মত পোষণ করা হয়। এ মতের শেষফল এই দাঁড়ায় যে, অপরাধীর বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলায় রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় ও তার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে।

www.pathagar.com

৩– তৃতীয় প্রকার : অভিযোগ দায়েরের মিশ্র পদ্ধতি

এটা অভিযোগ দায়েরের এমন একটা পদ্ধতি, যাতে কোন পক্ষের একক ও চরম অধিকার নেই। অভিযোগ দায়েরে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের অধিকার স্বীকার করা হয়। লক্ষণীয় যে, এ পদ্ধতি পূর্বোক্ত দুই পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা মনে হলেও তা কার্যত রাষ্ট্রের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে এবং অধিকাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা দায়েরে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রের অধিকার অগ্রগণ্য বলে বিবেচনা করেছে।

৪– চতুর্থ প্রকার : ইসলামে অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি

ইসলামে মানুষ একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন এবং আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুকে তার অধীন করে দিয়েছেন। তাকে দিয়েছেন স্বাধীনতার অধিকার এবং অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ছাড়াই আল্লাহর নিয়ামতকে ভোগদখল করার অধিকার।

অভিযোগ দায়েরের ইসলামী পদ্ধতি অপরাধকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। তার একটা শ্রেণীরূপে নির্ধারণ করেছে তা'যীরযোগ্য অপরাধকে। এসব অপরাধ সমাজের তেমন বড় কোন ক্ষতি সাধন করে না। ফৌজদারী মামলায় প্রচুর অধিকার ভোগ করে এর পক্ষসমূহ।

ইসলাম অপরাধের আরেকটি শ্রেণী নির্ধারণ করেছে হুদূদের অপরাধগুলোতে। এ অপরাধগুলো এতটা গুরুতর ও মারাত্মক যে, এগুলো সংঘটিত হলেই গোটা সমাজ, তার নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। আর এসব অপরাধে অভিযোগ ও মামলা দায়ের করা সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার, অপরাধ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নয়।

এই শ্রেণীবিন্যাসকে আমরা অন্যভাবেও দেখাতে পারি। সেটি হলো, অপরাধ দুই প্রকারের : ব্যক্তিগত অপরাধ ও সামাজিক অপরাধ।

ব্যক্তিগত অপরাধ ব্যক্তির অধিকার খর্ব করে। আর সামাজিক অপরাধ আল্লাহর অধিকার বা সমাজের অধিকার খর্ব করে। প্রথমোক্ত অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অপরাধীকে ক্ষমা করার অধিকার দেয়া যেতে পারে। কিন্তু খুন বা যখম করার অপরাধ ব্যতীত আর কোন সামাজিক অপরাধে তাকে ক্ষমার অধিকার দেয়া যায় না। খুন বা যখমের অপরাধ, যার শাস্তি কিসাস (খুন বা যখমের বদলায় খুন বা সমপরিমাণ যখম) ও দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা) ক্ষতিগ্রস্তের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এ অপরাধের সম্পর্ক সমাজের সাথে যতটা, তার চেয়ে

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্তের সাথে ঢের বেশী। কেননা হত্যা বা যখমের অপরাধ ব্যক্তির জীবনের ওপর যত বড় আক্রমণের আকারেই ঘটুন না কেন, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর তত মারাত্মভাবে সংঘটিত হয় না।

অবশ্য চুরির ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা এ অপরাধ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে হুমকির মুখে নিক্ষেপ করে। কারণ চোর যে কোন জায়গায় যে কোন ব্যক্তির সম্পদের প্রতি লালায়িত থাকে, কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পদের প্রতি নয়।

মুসলিম ফকীহগণ মনে করেন, অপরাধে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ বন্ধ হয়। কেননা ক্ষমা মানুষের মনের আপোষকামিতা ও পরিচ্ছন্নতা থেকে উদ্ভূত। তাই শাস্তি দ্বারা যে উপকারিতা কামনা করা হয়, ক্ষমা দ্বারা সেই উপকারিতা তো পাওয়া যায়ই, উপরন্তু এমন কিছু বাড়তি সুফলও পাওয়া যায়, যা শাস্তি থেকে পাওয়া অসম্ভব।

অপরাধ

অপরাধী ও অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার নিয়ে আলোচনার আগে অপরাধ বা جناية (জিনায়াত) এর অর্থ ব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয়। কেননা উক্ত অধিকার নিয়ে আলোচনার জন্য ওটা খুবই জরুরী।

আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক অর্থে আরবীতে جناية বা অপরাধ বলা হয় এমন পাপ বা অপরাধকে যা শাস্তিযোগ্য।[১]

পারিভাষিক অর্থ : ফকীহগণ অপরাধের সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের কতকের মতে অপরাধ বা جناية শরীরের ওপর এমন আঘাত বা আক্রমণকে বলা হয়, যে আঘাত বা আক্রমণের জন্য কিসাস বা আর্থিক ক্ষতিপূরণের আকারে শাস্তি পাওয়া অনিবার্য। আর যে আঘাত বা আক্রমণ শরীরের ওপর না হয়ে কোন সম্পদ বা অন্য কিছুর ওপর হয়, তাকে হুদূদ নামে আখ্যায়িত করেন।[২] কেউ কেউ অপরাধ দ্বারা এরূপ কাজকে বুঝান, যা মানুষের জান, মাল, ধর্ম, বুদ্ধি ও বংশের ওপর আঘাত সম্বলিত।[৩]

ইবনে ফারহূন[৪] বলেন, "দশম অধ্যায় : অপরাধ : অপরাধ কয়েক রকমের : যথা শরীরের বিরুদ্ধে অপরাধ, বুদ্ধির বিরুদ্ধে অপরাধ, সম্পদের বিরুদ্ধে অপরাধ, বংশের বিরুদ্ধে অপরাধ, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে অপরাধ, বিদ্রোহীদের অপরাধ, ধর্মের বিরুদ্ধে অপরাধ, নাস্তিকতা, আল্লাহকে, ফেরেশতাদেরকে, নবীগণকে ও সাহাবীগণকে গালি দেয়ার অপরাধ, যাদু ও নজরবন্দীর অপরাধ।[৫]

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা[৬] আল-মুগনীতে বলেন, যে কাজে 'তা'যীরী' শাস্তি দেয়া হয়, তার নাম جناية বা অপরাধ। তিনি বলেন, তা'যীর হচ্ছে শরীআত অনুমোদিত সেই শাস্তির নাম, যা "হদ্দ"যোগ্য নয় এমন অপরাধে দেয়া হয়। এর উদাহরণ হলো, লুণ্ঠন, আত্মসাত ও জবরদখল।[৭]

ফকীহদের কেউ কেউ অপরাধ (جناية)-এর অর্থ সংকুচিত করে শুধুমাত্র শরীরের ওপর আক্রমণকে অপরাধ নাম দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে অধিকতর প্রশস্ত রূপ দিয়ে এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন, শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ এমন কাজ, যাকে আল্লাহ 'হদ্দ' বা 'তা'যীর' দ্বারা তিরস্কৃত করেছেন।[৮]

অপরাধের দায় : এর অর্থ হলো, যে কাজের জন্য আল্লাহ 'হদ্দ' বা 'তা'যীর' দ্বারা তিরস্কার করেছেন, তার শাস্তির অপরিহার্যতা। আর যেসব কাজ অপরাধ হলেও তার বিচার হয় না, যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, সেগুলোকে পরিভাষায় অপরাধ বলা হয় না। যেখানেই শাস্তি নির্ধারিত থাকবে সেখানেই কাজটি অপরাধ গণ্য হবে এবং অপরাধের দায়দায়িত্ব বিবেচনায় আসবে।

ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার

অপরাধ বিজ্ঞানের যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো অপরাধী। এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তার অপরাধের কারণ অনুসন্ধান, যাতে তাকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করা যায় এবং তার দোষ সংশোধন করা যায়। এই গুরুত্বটা ক্ষতিগ্রস্ত কখনো পায়নি, বিশেষত অপরাধের দরুন তার ও তার পরিবারের যে ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টি কখনো গুরুত্বের সাথে ভাবা হয়নি।

আধুনিক অপরাধ বিজ্ঞান যে বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে তার অন্যতম হলো, অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টি। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং এ উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ বরাদ্দের জন্য তহবিল গঠনের মধ্য দিয়ে গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়।

সাম্প্রতিক কালের নতুনভাবে প্রণীত কিছু ইউরোপীয় আইন অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণের আইনী ব্যবস্থা উদ্ভাবনে উদ্যোগী হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ইটালীয় একটি আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছে এবং অপরাধের জরিমানা থেকে অর্জিত তহবিল এই ক্ষতিপূরণে ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছে।

www.pathagar.com

অথচ এ ব্যাপারে ইসলামই সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নিয়েছে। ইসলামী শরীআতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, "لا يطل دم فى الاسلام" *"ইসলামে কোন রক্তপাত শাস্তিবিহীন নয়।"* এর তাৎপর্য এই যে, নিহতের পরিবারের পক্ষে যখন হত্যাকারী সনাক্ত করতে না পারার কারণে 'দিয়াত' বা রক্তপণ আদায় করা সম্ভবপর হয় না এবং "কাসামা" পদ্ধতির মাধ্যমেও তাকে সনাক্ত করা যায় না, তখন রক্তপণ বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে, নিহতের পরিবার যখন রক্তপণ আদায় করতে সক্ষম হয় না, তখনও তা দেয়া বাইতুল মালের দায়িত্ব। আর এই মহান মূলনীতি অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিপূরণ প্রদানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে।

কাসামা : যখন কোন এলাকায় এমন কোন নিহত ব্যক্তি পাওয়া যায়, যার দেহে আঘাত, প্রহার বা শ্বাসরোধ ইত্যাকার আলামত বিদ্যমান, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু হত্যাকারীর পরিচয় পাওয়া যায় না, তখন ঐ স্থানের বা গ্রামের বা নিকটতম স্থান বা বাড়ীর অধিবাসীদের মধ্য হতে নিহতের অভিভাবকের পছন্দ অনুযায়ী পঞ্চাশ ব্যক্তি এই মর্মে শপথ করবে যে, 'আল্লাহর কসম! আমি হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে চিনিও না'। আর যদি উপস্থিতির সংখ্যা পঞ্চাশের চেয়ে কম হয়, তাহলে তাদেরকে পুনরায় এমনভাবে শপথ করানো হবে, যাতে পঞ্চাশ পূর্ণ হয়। এমনকি একজন থাকলেও তাকে পঞ্চাশবার শপথ করানো হবে। একে কাসামা বা গণশপথ বলা হয়।

অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের ক্ষয়ক্ষতি মেনে নেয়া বা তাতে সম্মত হওয়া তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের সম্মতি ইসলামী শরীআতেও অপরাধকে বৈধতা দেয় না, মানব রচিত আইনেও নয়। কারণ ফিক্‌হ শাস্ত্রের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো, যে কোন অপরাধ, যা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে অথবা কারো অধিকার নষ্ট করে কিংবা কোন জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, তা যদি কোন একজন মাত্র ব্যক্তির ওপরও পতিত হয় এবং ক্ষতি যদি শরীরের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করার মত নাও হয়, তথাপি তা জনস্বার্থ ক্ষুণ্নকারী এবং কোন ক্রমেই তার প্রতি নমনীয়তা দেখানো যাবে না।

অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তের আরো একটি অধিকার হলো, তার পক্ষ থেকে দায়ের করা অভিযোগ ব্যতীত কোন ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করা যাবে না। এটা সেইসব অপরাধের বেলায় প্রযোজ্য, যা জনস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থের অধিকতর ক্ষতিসাধন

www.pathagar.com

করে। কেননা শাস্তিদানের ক্ষমতা শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগ থেকেই জন্ম নেয়। আর এর ভিত্তিতেই অধিকাংশ আইন প্রণীত হয়।

লক্ষণীয় যে, আঘাতে, পরিকল্পিত প্রহারে ও অনিচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের ঘটনায় অভিযোগ বা দাবি উত্থাপনকে ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগের শর্তাধীন করার দিক দিয়ে ইসলামী শরীআতের মানব রচিত আইনের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু গরমিল রয়েছে পরিকল্পিত বা প্রায় পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে। ইসলামী শরীআত এসব ক্ষেত্রেও অভিযোগ দায়েরকে ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগের শর্তাধীন করে, অথচ প্রচলিত মানব রচিত আইন তাকে ক্ষতিগ্রস্তের অভিযোগের শর্তাধীন করে না। অবশ্য পরিকল্পিত ও প্রায়-পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে যখন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কিসাসের দাবি থেকে নিবৃত্ত থাকে, তখনও শরীআত 'তা'যীর' প্রয়োগে আপত্তি করে না কেবল সমাজের অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে।

পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তিতে শরীআতে ও আধুনিক আইনে কোন পার্থক্য নেই। এই শাস্তি মানবীয় আইনে ইচ্ছাধীন জরিমানা ও তৎসহ কারাদণ্ড। উল্লেখ্য যে, জরিমানা ও দিয়াত কার্যত একই জিনিস। ক্ষতিগ্রস্তের আরো একটা অধিকার হলো শাস্তির দাবি করা। নর হত্যায় নিহতের অভিভাবক শাস্তি দাবি করার অধিকারী। আর অন্যান্য অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি শাস্তি দাবি করার অধিকারী। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দাবি করার যোগ্য না হয়, তাহলে দাবি করবে তার অভিভাবক। আর যার অভিভাবক নেই, তার অভিভাবক শাসক স্বয়ং। আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দাবি তোলার আগেই মারা যায়, তাহলে দাবি তোলার অধিকার বর্তাবে তার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনদের উপর। এ ক্ষেত্রে শরীআত ও মানবীয় আইন একমত।

এ সকল অপরাধে শরীআত মানবীয় আইনের সাথে এই মর্মে একমত যে, ক্ষতিগ্রস্তের আদালতের ফায়সালার আগে অভিযোগ প্রত্যাহারের অধিকার রয়েছে। আদালতের রায়ের পরে শরীআত অভিযোগ প্রত্যাহারের অনুমতি দেয়, কিন্তু মানবীয় আইন দেয় না। মানবীয় আইন মনে করে, শাস্তির পক্ষে আদালতের রায় ঘোষিত হওয়ামাত্র ক্ষতিগ্রস্তের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য মিসরীয় আইন এর বিরোধী। এ আইন আত্মীয়দের মধ্যে সংঘটিত ব্যভিচার ও চুরির ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তকে শাস্তি ক্ষমা করার অধিকার দেয় (দণ্ডবিধির ২৭৪ ও ৫১২ নং ধারা)।

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্তের বৈশিষ্ট্য

ক্ষতিগ্রস্তের একটি অন্যতম অধিকার হলো, সে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে অভিযুক্তের প্রতিপক্ষ। তাই প্রতিপক্ষের সকল অধিকার ও সকল দায়দায়িত্ব তার থাকবে। তার পক্ষে সাক্ষী হওয়া বৈধ হবে না অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের পর। কেননা প্রতিপক্ষ ও সাক্ষীর বৈশিষ্ট্য পরস্পর বিরোধী। এটাই হলো ইসলামী শরীআত ও ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের অনুমোদনকারী যে কোন ব্যবস্থার প্রচলিত রীতি।

সরকারী পর্যায়ে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আইনের বিভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা মিসরীয় আইনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। এ আইন মামলায় ক্ষতিগ্রস্তকে সাক্ষী হিসাবে শ্রবণের অনুমতি দেয়, এর ফলে তার প্রতিপক্ষসুলভ বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়। তা সত্ত্বেও তাকে প্রতিপক্ষ বা বাদীর অধিকার দেয়া হয়। ফ্রান্স ও ইটালির আইনও এর কাছাকাছি।

সারকথা

অপরাধীর অধিকার সমুন্নত রাখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তের অধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত আইনে। অথচ বহু শতাব্দী আগে ইসলাম অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্তের অধিকারের মধ্যে এই ভারসাম্য বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে। জীবন ও দৈহিক নিরাপত্তার ওপর পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত আক্রমণের শাস্তি হিসাবে কিসাস চালু করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সেখানে স্বেচ্ছায় আপোষে ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে দিয়াত তথা আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণে সম্মত হলে তারও অনুমতি দিয়ে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামী ফিক্‌হ মনে করে, কিসাস ও দিয়াতযোগ্য অপরাধগুলো দ্বারা শুধু প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই নয়, গোটা সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই যখন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কিসাস মাফ করে দেয়, এমনকি যদি দিয়াত নিয়েও মাফ করে দেয়, তাহলেও সমাজের অধিকার সমুন্নত রাখার স্বার্থে কোন না কোন তা'যীরী শাস্তি কার্যকর করা জরুরী। ইসলামী ফিক্‌হ আরো মনে করে যে, মানুষের জীবন বা তার দেহের নিরাপত্তা শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পত্তি নয়, বরং তাতে সমাজেরও অংশ রয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তার ওপর সংঘটিত অপরাধকে মেনেও নেয়, তথাপি তার এই মেনে নেয়াটা অপরাধকে বৈধ করে না।

www.pathagar.com

অপরাধীর অধিকার

তদন্ত ও বিচার এই উভয় পর্যায়ে মানবাধিকার সমুন্নত রাখা হয় দু'টি অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে। একটি প্রকৃত সত্য জানার ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে অপরাধের প্রকৃত স্বরূপ ও অপরাধীর পরিচয় উদঘাটনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারে সমাজের অধিকার, আর অপরটি নিজের স্বাধীনতা ও অধিকারকে হস্তক্ষেপমুক্ত রাখা ব্যক্তির অধিকার।

সাম্প্রতিকতম চিন্তাধারা ও প্রবণতা এ ব্যাপারে মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে যত বেশী পরিমাণে পারা যায় নিশ্চয়তা প্রদান করার পক্ষপাতী। যাতে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতায় ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অপরাধের পূর্ণ তদন্ত অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত দুটো পর্যায় –তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠানের পর্যায়ের সাথে শাস্তি কার্যকর করার পর্যায়টি যুক্ত করলে আরো ভালো হয়। কেননা শাস্তি কার্যকর করার পর্যায়টি খুবই কাছাকাছি একটি পর্যায়। সাম্প্রতিকতম প্রবণতা ও চিন্তাধারা এ পর্যায়টিকে প্রত্যক্ষ বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণের অধীনে রাখার পক্ষপাতী।

অভিযোগ গঠনকারী কর্তৃপক্ষ ও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ –এ দুই কর্তৃপক্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা কাম্য। যে চিন্তাধারাটি ব্যক্তির সর্বাধিক পরিমাণ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সাথে সংগতিপূর্ণ তা হচ্ছে, অভিযোগ গঠনকারী কর্তৃপক্ষ ও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের পরস্পর থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার অপরিহার্যতার চিন্তাধারা। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, প্রাথমিক তদন্ত বলতে বিচারের জন্য প্রমাণাদি সংগ্রহ ও মামলার প্রস্তুতিই বুঝায়। এর উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান ও উদঘাটন, চাই তা আসামীর পক্ষে যাক বা বিপক্ষে যাক। আর এই সত্য উদঘাটনের জন্য প্রয়োজন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা ও দুই পক্ষের কারো প্রতি বৈষম্য করা থেকে বিরত থাকা।

তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিচারিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকাই তার নিরপেক্ষতা ও বিভেদ-বৈষম্য থেকে বিরত থাকার যথার্থ নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে অভিযোগ গঠনকারী কর্তৃপক্ষ ও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের একীভূত হওয়া তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা অবলম্বনের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। কেননা সে একই সময়ে দুটো পরস্পর বিরোধী বিষয়কে

www.pathagar.com

একত্র করে। একদিকে সে অভিযোগ গঠনকারী কর্তৃপক্ষের মত, যে আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহে সচেষ্ট এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে উদগ্রীব। কাজেই সে আসামীর প্রতিপক্ষে। অপরদিকে সে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সদৃশ, যে নিরেট সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত, চাই তা আসামীর পক্ষে যাক বা বিরুদ্ধে যাক। এ হিসাবে সে একজন ন্যায়বিচারক বিচারপতির আসনে আসীন। তার মধ্যে ও আসামীর মধ্যে কোন প্রতিপক্ষ সুলভ সম্পর্ক নেই। আর যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একই সময়ে অভিযোগ গঠনে ও তদন্তে ভূমিকা রাখা যেমন অসম্ভব, তেমনি তদন্তের ভূমিকা পালনকালে অভিযুক্ত করার মনোভাব থেকে মুক্ত থাকাও অসম্ভব।

অপরাধীর অধিকার প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, মানুষ মাত্রেরই মূল অবস্থা হলো সে নির্দোষ (الاصل فى الانسان البراءة)। তাই তার দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর কোন সংশ্লিষ্ট আদালত থেকে জারিকৃত রায়ের ভিত্তিতে ছাড়া তার স্বাধীনতা খর্ব করা বা তাকে আটক করা বৈধ নয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাকে বিচারে সোপর্দ করা ও দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাকে গ্রেফতার ও আটক করার কিছু সংগত কারণ থাকতে পারে।

(১৯৫৫ সালে অপরাধ প্রতিরোধ ও অপরাধীদের সাথে আচরণের জন্য জাতিসংঘের প্রথম সম্মেলনের পক্ষ থেকে কারাবন্দীদের সাথে মানবিক পর্যায়ের আচরণের যে মূলনীতিসমূহ প্রকাশিত হয়, তার প্রতি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে। ওদিকে তিউনিসিয়ার সাংবিধানিক আইনের ১২ নং ধারায়, যা ১৯৫৯ সালের ১ জুন প্রকাশিত হয়, বলা হয়েছে : "যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয় সকল নিশ্চয়তা সম্বলিত বিচারকার্যের মধ্য দিয়ে দোষী সাব্যস্ত না হবে, ততক্ষণ সে নির্দোষ")।

এটা ঘটে থাকে এমন অবস্থায় যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং অভিযোগের আঙ্গুল তার দিকে নির্দেশ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তার পালিয়ে যাওয়া, সাক্ষীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা কিংবা প্রমাণাদি বিকৃত করার আশংকায় ও তা প্রতিরোধের স্বার্থে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ তাকে গ্রেফতার করা বা আটক করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। কখনো কখনো অভিযুক্ত কর্তৃক তার বাড়ীতে এমন সব জিনিস রাখার পক্ষে প্রমাণাদি পাওয়া যেতে পারে যা অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে তার বাড়ী তল্লাশী করাও জরুরী।

www.pathagar.com

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও তার গোপন তথ্যের পবিত্রতায় হস্তক্ষেপকারী এসব ব্যবস্থার সাথে অনেকগুলো শর্ত যুক্ত করা জরুরী।

প্রথমত, নিরপেক্ষ আদালতের পক্ষ থেকে এজন্য নির্দেশ জারী হওয়া চাই। অবশ্য অপরাধ নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ থাকার কারণে যেখানে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ কোনরূপ যুলুম হওয়ার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না, সেক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তদন্তের কর্তৃত্ব বিচার বিভাগীয় তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের হাতে থাকা জরুরী। অনুরূপভাবে এটাও জরুরী যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের সাথে জড়িত থাকা এবং তার পালানোর সংকল্প থাকা অথবা সাক্ষীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অথবা প্রমাণ নষ্ট করার ইচ্ছা থাকা সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে। অথবা এই মর্মে অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরাধ সংশ্লিষ্ট তথ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে অভিযুক্ত কর্তৃক কোন বিচারিক কর্তৃপক্ষের নিকট এ সকল পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের সম্ভাবনাও থাকা জরুরী।

এ সমস্ত নিশ্চয়তার গুরুত্বের প্রেক্ষিতে বহু ক্ষেত্রে দেশের সংবিধানে এগুলোর উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। কেননা সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন। বস্তুত এমন অনেক সংবিধান রয়েছে, যাতে ব্যক্তির স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানকারী ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এই স্বাধীনতায় একমাত্র আইনানুগ পন্থা ব্যতীত আর কোন পন্থায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এসব স্বাধীনতা সংরক্ষণের পক্ষে সুস্পষ্ট সাংবিধানিক আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো কোন কোন প্রশাসনিক বা বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপমূলক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করার ঘটনা ঘটে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, নিবর্তনমূলক বা সতর্কতামূলক গ্রেফতারী বা তার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে ক্ষমতার অযৌক্তিক অপপ্রয়োগ ঘটতে দেখা গেছে। অনেক সময় এমনও ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘ মেয়াদে নিবর্তনমূলকভাবে আটক রাখা হয়, তারপর আদালত তাকে নির্দোষ বলে রায় দেয়, অথবা তার ওপর কোন জরিমানা আরোপ করে অথবা এত ক্ষুদ্র মেয়াদের আটকাদেশ দেয়, যা তার নিবর্তনমূলক আটকাবস্থায় ইতিমধ্যে কাটানো মেয়াদের চেয়ে অনেক কম।

এ পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকে ভাবতে বাধ্য করেছে, নিবর্তনমূলক আটক বা অন্যান্য বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এমন দাবি তোলার

www.pathagar.com

অধিকার রাখে কিনা যে, যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া তার স্বাধীনতা হরণের কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর এই ক্ষতিপূরণ প্রদানে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব আছে কিনা, সেটাও তাদের ভেবে দেখতে হচ্ছে।

নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষতিপূরণ দানের নীতিটা আইনে পরিণত করার পর তার বাস্তবায়নও সম্পন্ন করেছে কয়েকটা ইউরোপীয় দেশ– যার মধ্যে রয়েছে অস্ট্রিয়া, জার্মানী, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশ, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, গ্রীস, মেক্সিকো ও ফ্রান্স।

দণ্ডবিধি সংক্রান্ত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন (রোম : ১৯৫৩) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুপারিশ করেছে, "নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভুল হয়ে থাকলে এবং আটকের পদক্ষেপটি নিপীড়নমূলক ছিল বলে জানা গেলে অভিযুক্তের প্রতি রাষ্ট্রের করণীয় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়"। অনুরূপভাবে ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত নিখিল ইউরোপীয় মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার রক্ষা চুক্তি এবং ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক নাগরিক অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি অযৌক্তিকভাবে যার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার হরণ করা হয় তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকার আছে বলে ঘোষণা করেছে।

আর যেহেতু নিবর্তনমূলক আটকাদেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত, তাই অপরাধীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা শেষে সেটি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র আলোচনা করা হবে।

আরব দেশসমূহের অধিকাংশ নির্বাহী আইনে সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, একমাত্র জটিল ও সন্দেহজনক পরিস্থিতি ব্যতীত যাবতীয় আটকাদেশ সব সময় আদালত অথবা বিচার বিভাগীয় তদন্ত পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারী হতে হবে। সন্দেহজনক ও জটিল পরিস্থিতিতে অভিযুক্তকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রেফতার করার অধিকার পুলিশের রয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর আসামীদের আদালতে বা তদন্তকারী বিচারকের সামনে পেশ করা হবে, যাতে তার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নির্বাহী আইনে অন্য ধরনের পরিস্থিতিও থাকতে পারে, যা বিচার বিভাগীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরকে সন্দেহজনক ও জটিল পরিস্থিতি ছাড়াও অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দিতে পারে। নির্দিষ্ট পর্যায়ের গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তের জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ উদ্রেকের জোরদার কারণ থাকলে তাকে শুধু গ্রেফতার করাই নয়, বরং তার দেহ তল্লাশী বা বাসস্থান

www.pathagar.com

তল্লাশীরও অনুমতি দেয়। তিউনিসীয় সাংবিধানিক আইনে জরুরী অবস্থা ব্যতীত সকল অবস্থায় বাসস্থানের পবিত্রতা ও পত্রযোগাযোগের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এই তল্লাশীর ব্যাপারে আদালত বা তদন্তকারী বিচারকের পক্ষ থেকে অথবা উভয়ের পক্ষ থেকে আদেশ জারী হওয়া জরুরী।

প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে অভিযুক্তদের অধিকার

আধুনিক ফৌজদারী অপরাধের বিচারবিধি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণাসমূহ এই মর্মে দাবি জানায় যে, আসামীর প্রতি অভিযোগ দায়েরের পর ও প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে তাকে "আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার" শীর্ষক একগুচ্ছ অধিকার দিতে হবে। কেননা এটা ইসলামের মূলনীতি যে, আসামীর অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে নিরপরাধ।

এই অধিকারসমূহের একটি হলো, তার ওপর আরোপিত অভিযোগটা ও তার প্রমাণাদি তার জবাবদিহিতার আগে ও তার স্বাধীনতা খর্বকারী পদক্ষেপ গ্রহণের আগে তার জানা চাই। কিছু কিছু দেশের সংবিধানে এ অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। কেননা এটা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের মধ্যে তার কথা বলা বা নীরবতা অবলম্বন উভয় অধিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আসামীকে তার কথা বলার সুযোগ দিতে হবে, আর তা দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে, কোন প্রকারের চাপ, জবরদস্তি, নির্যাতন বা চালাকী-চাতুরী ছাড়াই।

অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, তার ওপর কোন মাদক জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা, হিপনোটিজম বা কৃত্রিমভাবে ওষুধ দ্বারা ঘুম পাড়ানো কিংবা অনুরূপ এমন কোন উপকরণ প্রয়োগ করা –যা অভিযুক্তের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে ও তাকে নির্দিষ্ট কথা বলতে বাধ্য করে –নিষিদ্ধ করতে হবে। এই অধিকারের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, সে নীরব থাকতে চাইলে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা সকল প্রশ্নের বা কতক প্রশ্নের জবাব না দিতে চাইলে তাকে সে সুযোগ দেয়া হবে। আর এই নীরবতাকে বা কথা বলা থেকে তার এই নিবৃত্ত থাকাকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ বা ইংগিত বলে গ্রহণ করা হবে না।

বৃটেন ও অন্য কোন কোন দেশের আইনে একথা বিধিবদ্ধ রয়েছে যে, অভিযোগগুলো পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেয়া বাধ্যতামূলক যে, তাকে যেসব প্রশ্ন করা হবে তার জবাব না দেয়ারও অধিকার তার রয়েছে। (যেমন তিউনিসীয় আইনে রয়েছে

www.pathagar.com

যে, তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো অভিযুক্তকে জানিয়ে দেয়া, সে নিজের মনোনীত আইনজীবীর সামনে ছাড়া কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নয়)। অপরাধী বা অভিযুক্তের একটা সাধারণ অধিকার হলো, সে তদন্তের সকল তৎপরতায় উপস্থিত থাকতে পারবে, যাতে সে গোটা তদন্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং যখনই তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগের প্রমাণাদি উত্থাপন করা হবে তখনই তার জবাব দেয়ার সুযোগ পাবে।

প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে অভিযুক্তের আরো একটা সাধারণ অধিকার হলো, সে একজন সমর্থনকারীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে, যে তার সাথে প্রাথমিক তদন্তের বৈঠকগুলোতে উপস্থিত থাকবে, তাকে তার আইনী অধিকারগুলো সম্পর্কে অবহিত করবে, অভিযোগকারীর প্রমাণাদি খণ্ডন করতে তাকে সাহায্য করবে এবং নিজের আইনী অভিজ্ঞতা দ্বারা তার বিরুদ্ধে আনীত যুক্তি খণ্ডন করবে। বিচার চলাকালে আইনজীবীর অভিযুক্তের পাশে থাকা যখন বহু সংখ্যক আইনে বাধ্যতামূলক বিবেচনা করা হয়। কেননা প্রাথমিক তদন্তের পর্যায়ে আইনজীবীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়, যেমন অভিযুক্তকে আরো কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, উদাহরণস্বরূপ অতিশয় তাড়াহুড়ার ক্ষেত্রে এরূপ হয়ে থাকে।

প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্তসহ সকল পক্ষের উপস্থিতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ব্যতীত জরুরী। সেই বিশেষ অবস্থাগুলোতে পক্ষগুলোর অনুপস্থিতিতেও তদন্ত চালানো যায়। যেমন পক্ষগুলো যখন নিজেদের উপস্থিত থাকার কথা জানায়, তখন তাড়াহুড়া করলে সময় নষ্ট হওয়া ও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আর যখন অভিযুক্ত ও তার আইনজীবী কিছু বৈঠকে কিংবা তদন্ত কার্যক্রমে উপস্থিত থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, তখন তাদের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার তাদের থাকবে।

বিচারের স্তরে অভিযুক্তের অধিকার

ফৌজদারী মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো বিচারের স্তর। এখানেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়, মামলার ফয়সালা হয় এবং অভিযুক্তের পরিণতি কী তা স্থির হয়। এর আগে আদালত চূড়ান্ত তদন্ত সম্পন্ন করে, বাদীর সাক্ষ্য- প্রমাণ পর্যালোচনা করে, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক যুক্তিতর্ক শ্রবণ করে, তার

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে এবং সবার শেষে শাস্তি বা উপযুক্ত ব্যবস্থা অথবা তার নির্দোষিতা ঘোষণা করে।

অভিযুক্তের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় হলো, অপরাধীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান। সামাজিক আত্মরক্ষা নীতির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফৌজদারী অপরাধের বিচারের তদন্ত কার্যে এই তথ্যানুসন্ধান একটা অতীব জরুরী বিষয়। কেননা বিচারক এখানে অপরাধীর ব্যক্তিত্বের উপাদাগুলোর ওপর নির্ভর করতে, তার মূল্যায়ন করতে ও তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি নির্বাচন করার সময় উক্ত উপাদানগুলোকে বিবেচনা করতে বাধ্য, যাতে অপরাধীর সামাজিক পুনর্বাসনে উক্ত শাস্তি সহায়ক হয়।

"ব্যক্তিত্ব পর্যবেক্ষণ" কিংবা "রায় দেয়ার পূর্বে তথ্যানুসন্ধান"-এর এই ব্যবস্থা কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইউরোপে চালু হয়ে গেছে। আর শুধু কিশোরদের ব্যাপারে ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের ব্যবস্থা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ও অধিকাংশ আরব দেশে চালু রয়েছে।

অপরাধীর ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানের এই কাজে যে জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্বাস্থ্যগত অনুসন্ধান ও মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান। (অন্য কথায় স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা)। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় তার ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে। আরো অন্তর্ভুক্ত হবে তার পারিবারিক ইতিহাস, সামাজিক অবস্থান ও পটভূমি, তার শিক্ষাদীক্ষা, তার পেশা ও কর্ম, উপার্জন, পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুবান্ধব, মূল্যবোধ, ধারণা ও বিশ্বাস এবং অন্যান্য যা কিছু তার ব্যক্তিত্ব, পরিবেশ ও অপরাধে প্ররোচনা দানকারী ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাত করে, তার পর্যালোচনা ও অনুসন্ধান।

ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা, তথ্যানুসন্ধান ও তদন্তের প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করার জন্য ও তার উপযুক্ত রায় ঘোষণার জন্য এমন উপযুক্ত ফৌজদারী বিচারক নিয়োগ করা প্রয়োজন, যিনি যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও চিকিৎসা বিষয়ক তথ্যের অধিকারী হবেন।

প্রাথমিক তদন্তের পরে ও বিচার অনুষ্ঠানের পূর্বে যখন বাদী পক্ষ বিষয়টিকে বিচারে সোপর্দ করা সমীচীন মনে করবে, তখন ব্যক্তিত্ব পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় হতে পারে।

৯—

www.pathagar.com

আদালত বা বিচারকের সামনে অভিযুক্তের উপস্থিত হওয়াটাই তার একটা অধিকার বিবেচিত হয়ে থাকে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। ইসলামী শরীআত এবং মানব রচিত সংবিধান ও আইন এ অধিকারকে বিধিবদ্ধ করেছে। অধিবেশনের নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ব্যতীত তাকে অনুপস্থিত রাখা যাবে না। অভিযুক্তের আরো একটা অধিকার হলো, সে এমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের সামনে ন্যায়সংগত ও উন্মুক্ত শুনানী লাভ করবে, যার জন্য যাবতীয় নিশ্চয়তা বিধান করা হবে এবং যার সকল পদক্ষেপ ও কার্যক্রমকে সন্দেহমুক্ত রাখা হবে। অভিযুক্তের এ অধিকারও রয়েছে যে, সে নিজে অথবা কোন আইনজীবীর সাহায্য নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে। এটা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে আদালতকেও সাহায্য করবে।

আদালতের সামনে কথা বলা অথবা না বলার অধিকারও অভিযুক্তের রয়েছে। কথা না বলাকে তার বিপক্ষে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। অভিযুক্তের এ অধিকারও রয়েছে যে, তাদের নিরপেক্ষতায় তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করলে বিচারকদেরকে রায় দেয়া থেকে বিরত থাকার দাবি করতে পারবে। অনুরূপভাবে যখন বিভিন্ন আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ মারাত্মক ধরনের কোন পেশাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রতারণা বা অসচ্ছতা ইত্যাদি তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারও তার রয়েছে।

আর ত্রুটিমুক্ত রায় ও সুবিচারের স্বার্থে বিচারকের উচিত তার প্রদত্ত রায়ের কারণ বা যুক্তি বিশ্লেষণ করা, যাতে তার রায়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় অথবা বিপক্ষীয়রা তার সমালোচনা করতে পারে।

অভিযুক্তের এ অধিকারও রয়েছে যে, তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়ে যখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, অথচ সে নিজেকে নির্দোষ মনে করে, অথবা তাকে এমন শাস্তি প্রদান করা হয়, যা তার উপযুক্ত শাস্তির চেয়ে কঠোরতর, অথবা এমন ক্ষতিপূরণ তার ওপর ধার্য করা হয়, যা তার নিকট প্রতীয়মান ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশী, অথবা মামলার প্রক্রিয়া বা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় এমন কিছু উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে, যা বাতিলযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, তখন সে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। প্রশাসনিক আইন রায়ের সমালোচনার পদ্ধতি ও অভিযোগ পুনর্বিবেচনা ইত্যাদির পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।

অভিযুক্তের এ অধিকারও রয়েছে যে, সে দ্বিতীয় উচ্চ কোন আদালতে অথবা আপিল আদালতে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের পুনর্বিবেচনার আবেদন

www.pathagar.com

করতে পারে। অনুরূপ উর্ধতন কোন আদালতে তার বিরুদ্ধে ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে এই বলে সমালোচনাও করতে পারে যে, তা আইনের পরিপন্থী হয়েছে। কখনো কখনো এ উদ্দেশ্যে বিশেষ আদালত গঠিত হতে পারে, যা আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যার তদারকী করবে। এ ধরনের আদালতকে "রহিতকরণ আদালত", "বিশেষ আদালত" অথবা "পর্যবেক্ষণ আদালত" অথবা "নিরীক্ষণ আদালত" নাম দেয়া যেতে পারে।

ফৌজদারী বিচার ও কিশোর-তরুণ

ইসলামী শরীআতে ও আধুনিক আইনে কিশোর ও তরুণরা একটা বিশেষ ধরনের আচরণ পাওয়ার অধিকারী। এই বিশেষ ধরনের আচরণ স্বতন্ত্র আইন ও বিধিমালায় এমনভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের বিপথগামী হওয়ার বিভিন্ন দিক যেমন এর আওতায় এসে গেছে, সেগুলো সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তেমনি এই বিপথগামিতা প্রতিরোধের উপায়, তাদের বিচারের প্রক্রিয়া এবং তাদের বিচারের জন্য যুব-কিশোরদের সমস্যাবলী ও তাদের সাথে আচরণের পন্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ, মাননিবক ও সামাজিক বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে সুস্পষ্ট রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এসব যুব-কিশোরদের বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত তাদের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ ও তার সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যুব-কিশোরদের বিচার অনুষ্ঠানে এটি একটি মৌলিক বিষয়রূপে বিবেচিত হওয়া উচিত।

যুব-কিশোরদের উপর আদালত থেকে যে রায় দেয়া হবে, তাতে শুধু শাস্তির আদেশই থাকবে না, বরং তার সাথে যুক্ত থাকবে সংশোধনমূলক বিধি-ব্যবস্থাও। যেমন ভর্ৎসনা বা তিরস্কার অথবা অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করা, কোন নির্ভরযোগ্য তত্ত্বাবধায়কের তদারকীতে দেয়া, কিংবা যুব-কিশোরদের সংশোধন ও লালন-পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো অথবা বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সোপর্দ করা, যা মরক্কো ও তিউনিসে "প্রহরাধীন স্বাধীনতা" নামে পরিচিত, অথবা কোন বিশেষ ধরনের হাসপাতালের নিকট হস্তান্তর করা অথবা এ জাতীয় অন্য এমন কোন ব্যবস্থায় সোপর্দ করা, যা আদালতের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থারূপে প্রতীয়মান হয়।

বিচার অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে অভিযুক্ত বা অপরাধীর অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের একটা পন্থা হচ্ছে, শাস্তির রায় প্রদানকারী বিচারক শাস্তি প্রয়োগ ও কার্যকারিতা তদারক করবেন। কখনো যদি তিনি নিশ্চিত হন যে, শাস্তির উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

পূর্ণ হয়েছে, তখন তিনি শাস্তি পরিবর্তন করবেন অথবা তার অবসান ঘটাবেন। শাস্তিভোগের মেয়াদ চলাকালে কারাবন্দীদের অধিকারের তদারকী ও তত্ত্বাবধানে বিচার বিভাগীয় ভূমিকা ও অবদান সবচেয়ে বেশী কার্যকর ও উৎকৃষ্টতর।

নিবর্তনমূলক আটক মানুষের স্বাধীনতাকে কিছুটা হরণ করে বটে, তবে মারাত্মক কোন দুঃখবেদনার কারণ ঘটায় না। মানব সভ্যতা এখন পর্যন্ত এই আপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খুঁজে পায়নি বা এর চেয়ে উত্তম কোন বিকল্পের সন্ধান পায়নি। মুসলিম ফকীহদের মতে এ ধরনের আটক অত্যন্ত বিরল ঘটনা। কেননা যে কোন ব্যক্তির ওপর যে কোন একটা অভিযোগ আরোপিত হলেই তাকে তারা আটক বা গ্রেফতার করার অনুমতি দেননি। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধপ্রবণ না হয়, তাহলে তাঁদের ঐক্যমত অনুযায়ী তাকে আটক করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ।

নিবর্তনমূলক আটক, যাকে মিসরীয় আইনে নিরাপত্তামূলক আটক বলা হয়, এটা হচ্ছে অভিযুক্তকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আটক করা ও কারাগারে বন্দী রাখা, যতক্ষণ না আদালত তার অভিযোগ সম্পর্কে আদেশ দেয় অথবা তার আগেই সে মুক্তি পেয়ে যায়। একে সাময়িক আটকও বলা হয়। এতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

নিবর্তনমূলক আটক একটা ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। কেননা আদালত হয়তোবা শেষ পর্যন্ত তার ওপর আরোপিত অভিযোগ থেকে তাকে মুক্ত ঘোষণা করবে, যার জন্য সে ইতিমধ্যে দীর্ঘ দিন আটক থেকেছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার আওতায়। এ থেকেই বুঝা যায় বিষয়টা কত গুরুতর। এমনকি ফৌজদারী অপরাধ সংক্রান্ত জনৈক গ্রন্থকার বলেছেন, নিবর্তনমূলক আটক ব্যক্তি-স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় ত্যাগ, যা ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইন নির্ধারণ করেছে।

অধ্যাপক জান দোবলা তাঁর "তিউনিসিয়ার ফৌজদারী আইনের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তসার" গ্রন্থে বলেছেন, "নিবর্তনমূলক আটক একটা দুঃখজনক অথচ অনিবার্য ব্যাপার। তবে তা অবধারিত ব্যাপার এবং এর আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে, যদিও এটা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত স্বাধীনতা সংরক্ষণে বাধ্য। তিনি একমাত্র সামাজিক কাঠামোর স্বার্থ ও কল্যাণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আস্থাশীল না হওয়া পর্যন্তও নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করতে পারেন না। কিন্তু অপরাধীকে গ্রেফতার করাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে একটা শিক্ষার ছাপ রয়েছে। যারা এ দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কাছে

www.pathagar.com

এটা মূল শাস্তির মতই প্রতীয়মান হয়। কেননা সাধারণ মানুষ একে অপরাধের শাস্তির শুরুর পর্যায়ভুক্ত বলেই বিবেচনা করে।"

অধ্যাপক দোবলা-র উপরোক্ত উদ্ধৃতির শেষাংশকে নিবর্তনমূলক আটকের পক্ষের যুক্তি হিসাবে গণ্য করা হলে সে ব্যাপারে এটুকু মন্তব্য করার অবকাশ থাকে যে, এই আটক সাধাণের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় হয় তখনই, যখন আটককৃত ব্যক্তি যথার্থই অপরাধে জড়িত থাকে। কিন্তু যদি আটককৃত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে এমন কেউ হয়, যে সন্দেহভাজন হলেও আসলে সেই অপরাধে জড়িত নয়, যে অপরাধের জন্য তাকে নিবর্তনমূলকভাবে আটক করা হয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা হয়ে পড়ে অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। এ আটকের মর্মাঘাত কেবলমাত্র সুবিচারের স্বার্থের পবিত্রতার কথা চিন্তা করেই কিছুটা লাঘব করা যায় বা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

লক্ষণীয় যে, নিবর্তনমূলক আটকের বিষয়টির বেশ কিছু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সাধারণ সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষতিসাধনকারী কার্যকলাপে লিপ্তদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবকাঠামো সুরক্ষার জন্য জনসাধারণের অভিযোগ দায়েরের যে অধিকার বরাদ্দ রয়েছে, সেই অধিকারের আওতায় তদন্তের পন্থা হিসাবেই নিবর্তনমূলক আটকের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা জন্ম নিয়েছে।

১৯৬৮ সালের ২৪ জুলাই তারিখে জারীকৃত তিউনিসীয় দণ্ডবিধি আইনে বলা হয়েছে যে, নিবর্তনমূলক আটক একটা স্বেচ্ছামূলক ও ব্যতিক্রমী পন্থা, যার আশ্রয় নেয়া কেবল অনিবার্য পরিস্থিতিতেই এবং কতিপয় বিধিনিষেধ ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনেই অনুমোদনযোগ্য (৮৪ নং অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তিউনিসীয় দণ্ডবিধি আইনের ৮৫ নং অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তের যখন নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে, যে অপরাধে তাকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ দেয়া হয়েছে, সে অপরাধের নির্ধারিত সর্বোচ্চ কারাদণ্ড যখন এক বছরের কম হয় এবং ইতিপূর্বে তার বিরুদ্ধে যদি তিন মাসের বেশী কারাদণ্ডের রায় না হয়ে থাকে, তাহলে জিজ্ঞাসাবাদের পাঁচদিন পর অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া বাধ্যতামূলক।

আর যৌক্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, মুক্তি দেয়া বাধ্যতামূলক হওয়ার অর্থই হলো, নিবর্তনমূলক গ্রেফতারী অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। আর এও বুঝতে পারি যে, অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যখন আর্থিক জরিমানা মাত্র, তখন নিবর্তনমূলক আটককরণ নিষিদ্ধ। শর্তাবলীর এই সূক্ষ্ম পর্যালোচনার

www.pathagar.com

অর্থ দাঁড়ায়, কোন গুরুতর অপরাধী বাধ্যতামূলক মুক্তির সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিবর্তনমূলক গ্রেফতারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচারের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করা, যা আইন ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরা নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করে থাকেন।

১– আসামীকে অবশ্যই তদন্তকারী কর্মকর্তার হেফাজতে থাকতে হবে, যাতে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলেই তিনি তাকে সহজেই হাজির করে দিতে পারেন, বিশেষত যখন তার পালানোর আশংকা থাকে এবং অপরাধটা হয় গুরুতর।

২– স্বয়ং আসামীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিশেষত হত্যা ও ধর্ষণজনিত অপরাধের ক্ষেত্রে। কেননা তার আটক না হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও তার স্বজনদের প্রতিক্রিয়া এমন হতে পারে যে, অভিযুক্তের ওপর আক্রমণ করে বসতে পারে।

৩– অপরাধের প্রমাণ নষ্ট করা, সাক্ষীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এবং অপরাধের সরঞ্জামাদি বা আলামত গোপন করা থেকে আসামীকে বাধাদান।

৪– আসামীর যখন পালানোর আশংকা থাকে, তখন যাতে তার শাস্তি কার্যকর করা নিশ্চিত করা যায়।

উপরোক্ত তিউনিসীয় আইনে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য কয়েকটি বিধি অনুসরণ করা জরুরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব বিধির একটি হলো, একমাত্র গোপন অপরাধের ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক আটক প্রয়োগ করা যাবে। আর যখন এমন প্রবল পারিপার্শ্বিক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হবে, যা নিবর্তনমূলক আটককে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পন্থা হিসাবে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত হবে, যা নতুন অপরাধ সংঘটনকে প্রতিরোধ করবে, শাস্তি কার্যকর করাকে নিশ্চিত করবে অথবা তদন্ত প্রক্রিয়ার সঠিক অগ্রগতি নিশ্চিত করবে এবং যখন অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি হবে কারাদণ্ড (কমপক্ষে দু'বছর মেয়াদের। আর নিবর্তনমূলক গ্রেফতারীর মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে, যা কোন কোন দেশে মাত্র একবারই প্রযোজ্য) অথবা আরো কঠিন কোন শাস্তি।

অর্থাৎ এ সব অবস্থা ছাড়া নিবর্তনমূলক গ্রেফতারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, বিশেষত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, যখন তার বাসস্থান নির্দিষ্ট থাকে, অপরাধের সর্বোচ্চ আইনী শাস্তি এক বছরের কম কারাদণ্ড হয় এবং

www.pathagar.com

আসামীর বিরুদ্ধে যখন ইতিপূর্বে তিন মাসের বেশী শাস্তির রায় ঘোষিত হয়নি। এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হবে বাধ্যতামূলক।

আর যখন নিবর্তনমূলক গ্রেফতারী নিপীড়নমূলকভাবে সংঘটিত হয়, তখন কোন কোন দেশে সরকারী কোষাগার থেকে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করা যেতে পারে। আর্থিক ক্ষতিপূরণ বিচারকের মাধ্যমে দাবি করা যায়, কিংবা যে কর্মকর্তা অন্যায়ভাবে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ দিয়েছেন তার মাধ্যমেও দাবি করা যায়। অন্যায়ভাবে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ দান যেসব দেশে বিধিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে ফ্রান্স, লিবিয়া, জাপান ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য। মুসলিম ফকীহগণ ইসলামে ক্ষতিপূরণ দান বাধ্যতামূলক হওয়ার ব্যাপারে একমত। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ.

"আর যে ব্যক্তি তোমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করে তার ওপর ঠিক ততখানি বাড়াবাড়ি করো, যতখানি সে করেছে" (সূরা আল-বাকারা : আয়াত ১৯৪)।

আর রসূলুল্লাহ সা বলেছেন, "কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হবে না, কারো ক্ষতি করবেও না" (ইবনে মাজা, আহ্কাম, হাদীস নং ২৩৪০, পৃ : ৭৮৪)।

শরীআতে ও প্রচলিত আইনে ক্ষতিসাধন : মুসলিম ফকীহগণ বৈষয়িক ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দানে একমত। কেবল নৈতিক ক্ষতির ক্ষতিপূরণে তাদের মতভেদ রয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করাই উত্তম।

নিবর্তনমূলক আটকের উৎস

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটা যতটা তাত্ত্বিক, তার চেয়ে বেশী বাস্তব। এটা একদিকে যেমন নিবর্তনমূলক আটকের অনুসন্ধান ও বিচার বিভাগীয় কার্ডের অনুসন্ধান, বিশেষত কারাগারের কার্ডের মধ্যে গভীর ও অটুট সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করে, তেমনি বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যকার অটুট সম্পর্কেরও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমরা জনগণের সামষ্টিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কল্পনাও করতে পারি না। আর এই অভিযোগের অস্তিত্ব ততক্ষণ কল্পনা করা যায় না যতক্ষণ দেশে প্রত্যেক অপরাধের আইনানুগ শাস্তি নিশ্চিত করা হয়।

www.pathagar.com

আর নিবর্তনমূলক আটকাদেশ আইনানুগভাবে প্রদান করা হয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, যথা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ (প্রশাসকগণ, প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, তাদের সহকারীবৃন্দ, তদন্ত কর্মকর্তাগণ) এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ (প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, পুলিশ কর্মকর্তাগণ, অনুমোদিত বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, তদন্ত কর্মকর্তাগণ) এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ আদালতসমূহ এবং অভিযোগ দায়েরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, অপরাধ ও অপরাধী প্রতিরোধকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বস্তুত সামাজিক পরিবেশ যখন অপরাধের কারণে দূষিত হয়ে পড়ে, তখন এটা হয়ে দাঁড়ায় তদন্ত ও গবেষণার একটা উপায়। আর যখন কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপিত হয়, তখন অপরাধের গুরুত্ব ও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অনুপাতে নিবর্তনমূলক আটকের উপকরণের আশ্রয় নেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

আর যাদেরকে নিরাপত্তামূলক আটক করা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সাথে বিশেষ আচরণ করা হয়। যেমন কারাগারে তাদের জন্য বিশেষ কক্ষ প্রস্তুত করা হয় এবং তাদেরকে দণ্ডিতদের সাথে রাখা হয় না। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়, এমন উপায়ে তাদের জন্য পৃথক পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তাদের কাছে যেসব চিঠিপত্র আসে, তা তাদেরকে দেয়া হয়। তাদের আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়, জেলখানায় যেসব খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তা কিনবার সুযোগ দেয়া হয়, এমনকি জেলের বাইরে থেকেও কিনতে দেয়া হয়। তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেলের ভেতরে কাজে নিয়োগ করা হয় না। কাজের ধরন বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় এবং তার সুফল তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়তে, শরীরচর্চা করতে ও পছন্দনীয় আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়।

নিবর্তনমূলক আটকাদেশের অবসান

অভিযুক্তকে সাময়িকভাবে মুক্তিদানের মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের অবসান ঘটে। এই মুক্তির আদেশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ দিতে পারেন।

১– তদন্ত কর্মকর্তা (বিচার বিভাগীয়) যখন তিনি মামালার তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেননা তিনিই নৈমিত্তিক বিচারক কর্তৃপক্ষ, যার নিকট নিবর্তনমূলক আটকের অনুমতি ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মুক্তির অনুমতি দানের ক্ষমতাও তার হাতে ন্যস্ত।

www.pathagar.com

২- অভিযোগ দায়েরকারী কর্তৃপক্ষ : মামলা যখন তার নিকট স্থানান্তরিত হয়, তখন তিনি সাময়িক মুক্তিদানের ক্ষমতা পেতে পারেন, চাই তা আপিলের প্রক্রিয়ায় হোক অথবা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েই হোক। তিনি যেমন আটক করতে পারেন, তেমনি মুক্তিও দিতে পারেন।

৩- আদালত : আদালতগুলো যেমন নিবর্তনমূলক আটকাদেশ দিতে পারেন, তেমনি মুক্তির আদেশও দিতে পারেন।

৪- মামলা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ : তাদের বা অন্যদের পক্ষ থেকে দেয়া আটকাদেশ বাতিল করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে।

৫- বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, তারা যাদেরকে আটকাদেশ দেন, তাদেরকে তারা সাময়িকভাবে মুক্তি দিতে পারেন। মুক্তি জামিনেও হতে পারে, জামিন ছাড়াও হতে পারে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের পাঁচদিন পর এই মুক্তি অবধারিত। এ সুবিধাটা তার জন্য, যার নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে, যে ইতিপূর্বে তিন মাসের বেশী কারাদণ্ড ভোগ করেনি এবং যখন অপরাধের নির্ধারিত কারাদণ্ড এক বছরের কম হয়।

সাময়িক মুক্তির জন্য আর্থিক জামিন বা ব্যক্তিগত জামিন শর্ত করা হতে পারে। অভিযুক্ত স্বয়ং এই মুক্তি প্রার্থনা করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটকের জন্য সাময়িক মুক্তিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বিবেচনা করা হয়। এই বিকল্প শর্তহীন বা শর্তযুক্ত দুই-ই হতে পারে। যেমন কোন একটা পরিবার তার দায়িত্ব নিতে পারে, অথবা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের বা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তার বাসস্থান সন্নিহিত থানায় নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর গিয়ে নিজের উপস্থিতি ও নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রমাণ দিতে হবে যখনই তারা ডাকেন। তার ওপর এরূপ শর্ত আরোপ করা যেতে পারে যে, তার অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তদের ও তাদের স্বজনদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সে নির্দিষ্ট স্থানে, পাড়ায় বা শহরে যাতায়াত ও ঘোরাফেরা করবে না। এ ধরনের শর্ত লিখিতভাবেও দেয়া যেতে পারে।

তথ্যনির্দেশিকা

১. দ্র. লিসানুল আরাব, আল-কামূসুল মুহীত, মুখতারুস সিহাহ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, শিরো. ج- ن- ى।

www.pathagar.com

২. আয-যায়লাঈ, তাবঈনুল হাকাইক, ৬খ, পৃ. ৯৭; আল-হাসকাফী, আদ-দুররুল মুখতার, ৬খ, পৃ. ৫৭৭; আল-আদাবী, হাশিয়া আলাল-খারাশী, ৮খ, পৃ. ৩৫২; আন-নাওয়াবী, রাওদাতুত তালিবীন, ৯খ, পৃ. ১২২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ৮খ, পৃ. ২৫৯।

৩. আলাউদ্দীন আল-হানাফী, মুঈনুল হুক্কাম, পৃ. ১৮০; ইবনে ফারহূন, তাবসিরাতুল হুক্কাম, ২খ, পৃ. ২২৯; ইবনে জুযী, কাওয়ানীনুল আহ্কাম, পৃ. ৩৭৩।

৪. ইবনে ফারহূন, ইবরাহীম ইবনে আলী (মৃ. ৭৯৯ হি.), আইনজ্ঞ, বিচারক, ঐতিহাসিক, তাঁর গ্রন্থ আদ-দীবাজুল মুযাহ্হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ান উলামাইল মাযহাব; দ্র. আল-কারাফী বাদরুদ্দীন, তাওশীহুদ দীবাজ ওয়া হিলয়াতুল ইবতিহাজ, পৃ. ৪৫-৪৬; আল-আয়নী হলেন আয়নুল মুআছ্ছারা-এর রচয়িতা।

৫. ইবনে ফারহূন, তাবসিরাতুল হুক্কাম, পৃ. ২২১-২৩০।

৬. ইবনে কুদামা (মৃ. ৬২০ হি.), মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন, শায়খুল ইসলাম, হাম্বালী ফকীহ।

৭. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ১০খ, পৃ. ৩৪৭।

৮. আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্কামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২১৯; আবু ইয়া'লা, আল-আহ্কামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২৫৭।

গ্রন্থপঞ্জী

قائمة المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم (رواية حفص)

٢- ابن آدم (فى ترتيب محتويات القائمة وقع اعتماد "أبو" ولم يقع اعتماد "ابن".) يحيى بن آدم بن سليمان القرشى (٢٠٣ هـ - ٨١٨ م)، كتاب الخراج. تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة دار المعارف، بيروت، لبنان.

٣- أبو داود السجستانى سليمان بن الأشعث (هـ ٢٧٥ م) هـ سنن أبى داود تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت.

٤- أبو زهرة محمد : الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى، الجريمة، دار الفكر العربى، القاهرة.

٥- أبو يعلى الحنبلى القاضى محمد بن الحسين الفراء (٤٥٨ هـ)، الأحكام السلطانية. شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى، ط ١- ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م ط ٢-١٣٦٨ هـ ١٩٤٨ م مصر.

٦- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبى حنفية) (١٨٢ هـ - ٧٩٨ م)،

www.pathagar.com

كتاب الخراج، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٧- أريك هاريموس : اتفاق حقوق الإنسان، تقرير مقدم إلى مؤتمر الخبراء العرب المجتمعين فى سيراكوزا فى ديسمبر ١٩٨٦.
٨- د. أكيهارد مولر رابارد : دور مجلس أوروبا فى العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. تقرير مقدم إلى ندوة حقوق الإنسان بهلسنكى فى يونيو ١٩٨٦ وبسيراكوزا فى ديسمبر : ١٩٨٥.
٩- بدران أبو العينين بدران : حقوق الأولاد فى الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر ١٩٨١ م - ١٤٠١ هـ.
١٠- بهنسى أحمد فتحى : الحد والتعزير، مكتبة الوعى العربى مصر.
١١- البيهقى أبو بكر أحمد بن الحسين بن على (٤٥٨ هـ) السنن الكبرى. ط ١ حيدر آباد. النهد. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية : ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٥ م.
١٢- الترمذى محمد بن عيسى بن سودة (٢٧٩ هـ) سنن الترمذى وهو الجامع الصحيح تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان خمسة أجزاء دار الفكر بيروت.
١٣- تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان عن عامى : ١٩٨٦-١٩٨٧.
١٤- ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تقى الدين (٧٢٨ هـ - ١٣٢٨ م.) السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية، دار الكتب العربية، بيروت ط ٤.
١٥- ابن جزى محمد بن أحمد أبو القاسم (٧٤١ هـ) قوانين الأحلكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية. دار العلم للملايين، بيروت.
١٦- جمهورية مصر العربية : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية : موسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامى ج ٩ القاهرة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م.
١٧- الجوهرى إسماعيل بن حماد : تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط ٢. دار العلم للملايين بيروت : ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

www.pathagar.com

١٨- الحاكم النيسابورى، أبو عبد اللّه : المستدرك على الصحيحين، نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة. الرياض.
١٩- ابن مجد أحمد بن على (٨٥٢ هـ) فتح البارى شرح صحيح البخارى ١٤ مجلداً. دار المعرفة بيروت - لبنان.
٢٠- حقوق الإنسان. المجلدات الأربعة الصادرة عن المعهد الدولى للدراسات العليا فى العلوم الجنائية. سيراكوزا. إيطاليا. نشر دار العلوم للملايين. بيروت : ١٩٨٨ م - ١٤٠٨ هـ
٢١- ابن حنبل أحمد : المسند، طبعة المكتب الإسلامى للطباعة والنشر. دار صادر. بيروت : ١٣٨٩-١٩٦٩.
٢٢- الخرشى (١١٠١هـ) أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه : شرح مختصر خليل (٧٤٩ هـ) وبهامشه حاشية العدوى (١١٨٩ هـ)، دار صادر، بيروت.
٢٣- د. ونسنك - أ - ي : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى. ٧ مجلدات. مكتبة بريل فى مدينة ليدن. (١٣٥٥ هـ - ١٩٣٦ م).
٢٤- الدرينى محمد فتحى : الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده. مطبعة دمشق - ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.
٢٥- الدسوقي محد بن أحمد بن عرفة (١٢٣٠ هـ) : حاشيته على الشرح الكبير لأبى البركات أحمد الدردير (١٢٠١ هـ) ٤ أجزاء طبعة المكتبة التجارية الكبرى، توزيع دار الفكر. بيروت - لبنان.
٢٦- الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : مختار الصحاح. ط ١. لبنان ١٩٦٧ م - ١٣٨٧ هـ
٢٧- راغب، محمد عطية : التمهيد لدراسة الجريمة السياسية في التشريع الجنائى العربى المقارن. ط ١. مكتبة النهضة. مصر.
٢٨- ابن رشد (الحفيد) أبو الوليد محمد بن أحمد (٥٩٥ هـ) : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر. بيروت - لبنان.
٢٩- الزحيلي، وهبه : ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٩ م).
٣٠- الزرقاء مصطفى أحمد : المدخل الفقهى العام. ١٣٨٧ هـ - ١٩٨٦ م - ١٣٨٨ هـ دار الفكر. بيروت.

www.pathagar.com

٣١- الزرقاني عبد الباقي (١٠٩٩ هـ) شرح مختصر خليل. مطبعة محمد أفندي مصطفى بمصر.
٣٢- الزركلي، خير الدين : الأعلام. ط ٢- ١٠ أجزاء - ١٣٧٣ هـ - ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٤ م - ١٩٥٩ م.
٣٣- الزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد اللّه بن يوسف (٧٦٤ هـ - نصب الراية لأحاديث الهداية ط - ١ - ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م.
٣٤- السبكي عبد الوهاب بن علي، تاج الدين، أبو نصر (٧١١ هـ) طبقات الشافعية الكبرى. مطبعة عيسى البابى الحبلى وشركائه، ط ١. مصر، ٦ أجزاء في ٣ مجلدات.
٣٥- ستانيسلاف - ١ - نهليك : عرض موجز للقانونه الدولى الإنساني. المجلة الدولية للصليب الأحمر يوليو ١٩٨٤ م - ١٤٠٤ هـ
٣٦- الشاطبي، إبراهيم بن موسى - أبو إسحاق (٧٩٠ هـ) : الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية - ٤ أجزاء. دار الفكر العربي. القاهرة.
٣٧- الشربيني. محمد بن محمد، الخطيب. (٩٧٧ هـ) : مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. طبع شركة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٧ م.
٣٨- الشيباني محمد بن الحسن. (١٨٩ هـ) كتاب السير الكبير. الشيباني محمد بن الحسن - كتاب السير الصغير.
٤٠- الشيرازي إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الفيروز أبادي (٤٧٦ هـ) المهذب في فقه الإمام الشافعي. طبع مصطفى البابى الحلبي. ط ٢ - ١٣٧٩ هـ - ١١٥٩ هـ - ١٩٥٩ م - مصر.
٤١- ابن عابدين، محمد أمين (١١٩٨ هـ) : الدر المختار مع رد المحتار شرح تنوير الأبصار المشهور بحاشية ابن عابدين مطبعة مصطفى البابي. ط ٣ - ١٣٢٤ هـ - ١٩٠٦ م مصر.
٤٢- ابن عاشور، محمد الطاهر (الشيخ الإمام) (١٢ رجب ١٣٣٩هـ - ١١ اب ١٩٧٣) مقاصد الشريعة الاسلامية مجلد واحد. طبعة الشركة التونسية للتوزيع. تونس.
٤٣- عبد الباقي، محمد فؤاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،

www.pathagar.com

مجلد واحد، دار الفكر للطباعة والنشتر ط ٢ - ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٤٤- ابن عبد الرفيع. إبراهيم أبو إسحاق (٧٣٣ هـ) : معين الحكام على القضايا والأحكام. تحقيق محمد بن عياد. جزءان. مطبعة دار الغرب الإسلامي. بيروت ١٩٨٩ م - ١٤٠٩ هـ
٤٥- ابن العربي، محمد بن عبد اللّه، أبو بكر : أحكام القرآن. ٤ أجزاء، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت، لبنان.
٤٦- العقاد، عباس محمود : الإنسان فى القرآن الكريم، دار السلام، القاهرة، ١٩٩٣ م - ١٣٩٣ هـ
٤٧- ابن العماد الحنبلي، عبد الحى؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ٨ أجزاء في ٤ مجلدات. بيروت - لبنان.
٤٨- عودة، عبد القادر : التشريع الجنائى الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، جزءان مؤسسة الرسالة. ط ٤ - ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. بيروت.
٤٩- فرانسوا زيوري : نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني. مطبعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. جينيف. ١٩٨٤ م.
٥٠- ابن فرحون، إبراهيم. برهان الدين اليعمرى المدني (٧٩٩ هـ) : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
٥١- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. دار الكتب العليمة بيروتو لبنان.
٥٢- الفيروزابادي مجد الدين : القاموس المحيط، دار الجيل، بيروت، لبنان.
٥٣- الفيومي، أحمد بن محمد بن على المقري. (٧٧٠ هـ) : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، دار الكتب العلمية. ١٣٩٨ هـ - ١٩٨٧ م. بيروت - لبنان.
٥٤- القاسم بن سلام، أبو عبيد (٢٢٤ هـ) الهروى البغدادي : كتاب الأموال. تحقيق محمد حامد الفقي. مطبعة محمد عبد اللطيف الحجازي - القاهرة.

www.pathagar.com

٥٥- القانون الدستورى التونسي.
٥٦- ابن قدامة، عبد اللّه بن أحمد المقدسي، موفق الدين، أبو محمد (٦٢٠ هـ) : المغني شرح علي مختصر الخرقي. طبعة رشيد رضا. ١٩٦٧ م - ١٣٨٧ هـ
٥٧- قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الإفريقية. وزارة الخارجية المصرية ١٩٨٥ م - ١٤٠٥ هـ
٥٨- القرافي، أحمد بن إدريس، أبو العباس (٦٨٢، أو ٦٨٤ هـ- ١٢٨٤ م - ١٢٨٢ م) : أنوار البروق في أنواء الفروق ٤ أجزاء. مطبعة دار إحياء الكتب العربية. مصر. ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٥ م.
٥٩- الكتب الستة. مطبعة اسطنبول. ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٦٠- كحالة، عمر رضا : معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية ١٢ جزء. مطبعة الترقي : دمشق ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م.
٦١- لجنة من العلماء والباحثين بإشراف محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة. مجلدان. دار النهضة بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٦٢- مالك بن أنس (١٧٩ هـ) : الموطأ. طبعة دار النفائس للطباعة والنشر، شرح وتعليق أحمد راتب ١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م. بيروت.
٦٣- الماوردي، علي بن محمد، أبو الحسن، البصري الشافعي : (٤٥٩ هـ).
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ط ١ - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي. مصر.
٦٤- أدب القاض. طبعة بغداد : ١٩٧٢ م - ١٣٧٢ هـ
٦٥- مجلس أوروبا : المعاهدات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. دار العلم للملايين. ط ١. آب : ١٩٨٩ م - ١٤٠٩ هـ
٦٦- مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط، طبعة المكتبة الإسلامية. اسطنبول تركيا.
٦٧- محمد رضا : أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين مجلد واحد منشورات دار الحكمة للطباعة والنشر. دمشق سورية.
٦٨- محمد رضا : الفاروق عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين

www.pathagar.com

مجلد واحد. منشورات دار الحكمة للطباعة والنشر. دمشق سورية.
٦٩- مطبوعات مجلس أوروبا ستراسبورغ : ٨٧.
٧٠- ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (٧١١ هـ) : لسان العرب المؤسسة المصرية العامة للتاليف والأنباء والنشر دار لسان العرب. بيروت.
٧١- الميداني محمد أمين : نظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان. دار النشر، عمان، الأردن، ١٩٨٩ م - ١٤٠٩ هـ.
٧٢- ابن نجيم المصري زين العابدين، إبراهيم. (٩٧٠ هـ) الأشباه والنظائر. تحقيق عبد العزيز الوكيل. نشر مؤسسة الحلبي وشركائه. سنة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.
٧٣- النووي، يحيى بن شرف، أبو زكريا، الشافعي (٦٧٦ هـ) المجموع شرح المهذب. طبعة إدارة الطباعة المنيرية. القاهرة. مصر.
٧٤- صحيح مسلم بشرح النووي ١٨ جزء في ٩ مجلدات. دار الفكر بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
٧٥- الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر (- ٨٠٧ هـ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد عشرة أجزاء في خمسة مجلدات منشورات موسسة المعارف. بيروت - لبنان : ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

www.pathagar.com

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ